নশ্বর সিরিজ - ১

ধ্রুবতারা

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক
শ্রীসুবোধ চন্দ্র সুর
শরৎ-সাহিত্য-ভবন
২৫, ভূপেন্দ্র বসু এভিনিউ,
কলিকাতা ৪

প্রথম মুদ্রণ ১৩৬১

মুদ্রাকর—শ্রীচুনি লাল শীল
আনন্দময়ী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৪৩বি, নিমতলা ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

উপহার

বাসন্তিকে

জন্মদিনে দিলাম

প্রকাশক

শ্রীসুবোধ [illegible]

মুদ্রাকর—শ্রীচুনি লাল শীল

আনন্দময়ী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

বি, নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

অবিনশ্বর-সিরিজ

রূপায়িত করেছেন, চিত্রশিল্পী—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

———

পরিচালনা—

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

('কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির' প্রতিষ্ঠাতা)

শরৎ • সাহিত্য • ভবন

ভূমিকা

আজকের পৃথিবীর সীমানা গিয়েছে বেড়ে। আজকের পৃথিবীর নাগরিক যাদের হতে হবে, 'তাদের পরিচিত' হতে হবে এই বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে।

তোমরা, যারা আজ বাংলার কিশোর-কিশোরী, তোমরাই হবে একদিন এই বৃহত্তর পৃথিবীর নাগরিক। সুতরাং পৃথিবীব চারদিকে তোমাদের দৃষ্টিকে দিতে হবে প্রসারিত ক'রে··বিচিত্র বিশাল বিশ্বের দিকে-দিকে বেরুতে হবে তোমাদের মানসিক অ্যাডভেঞ্চারে। 'ধ্রুবতারা'র প্রত্যেক লেখার পেছনে আছে, সেই আদর্শের ইঙ্গিত।

লেখক ধন্য হবে, যদি একটি ছেলেরও মনে লাগে সেই আদর্শের ছোঁওয়া।

—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

মাগো,
ছিন্ন-অঙ্গ দীর্ণ-প্রাণ এই বাংলায়
আবার বেজে উঠেছে তোর আগমনী…
শিউলী-গন্ধী বাংলার এই শারদ-প্রভাতে
আবার উঠছে তোর পুজোর ধুপের গন্ধ…
কুমোর গ'ড়ে তুলছে তোর দশভুজা প্রতিমা,
নতুনের আনন্দে নেচে উঠছে আবার পুরনো মন…
পুরোহিত পড়ছে মন্ত্র, জ্বলছে আরতির পঞ্চশিখা,
নগরে, গ্রামে, পথে, প্রান্তরে আবার উঠছে কোলাহল…
তবু অশ্রুহীন শুষ্ককণ্ঠে আজ সুধাই তোকে,
এই আগমনীর পেছনে সত্যিই কি আছে তোর আগমন ?
বাংলার শরৎ-প্রভাতে আছে কি শারদীয়া ?
শিউলীর গন্ধে আছে কি সেই পুজো-পুজো সুবাস ?
প্রতিমার মাটিয় আড়ালে জেগেছে কি মা'র প্রাণ ?
দশমীর রাতে কি বাজলো বিজয়ার শঙ্খ ?
বাঙালীর ঘরে, বাংলার ঘরে,
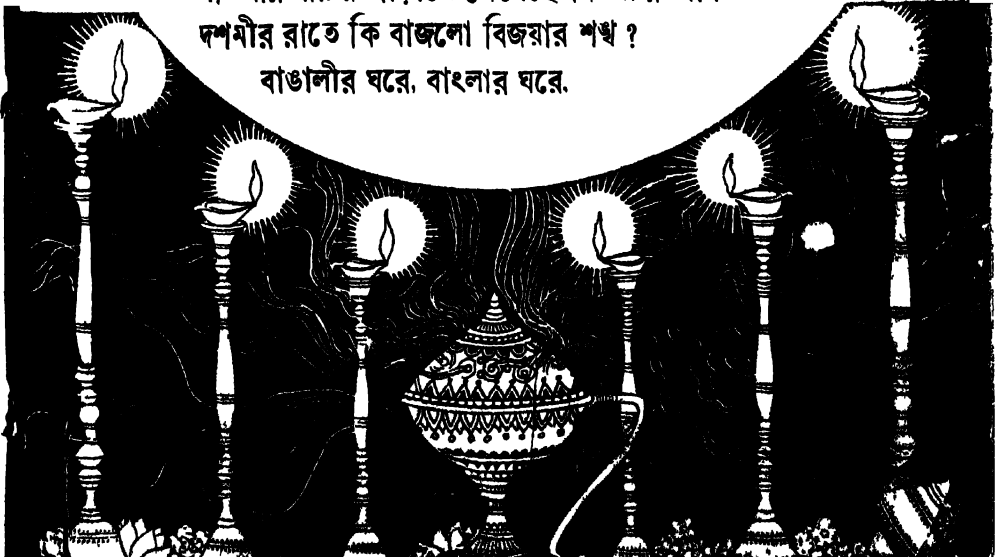
বাঙালীর দেহে, বাঙালীর মনে,
পড়লো কি তোর অসুর-দলন রক্ত-চরণের রাঙা ছাপ ?

* *

অসুরের ভয়ে দেবতারা সেদিন কেঁদেছিল,
ভয়ে মানুষের ছদ্মবেশে যেদিন ঘুরে বেড়াতো দেবতারা,
সেদিন ভয়ার্ত্ত দেবতাদের দুর্গতি দূর করবার জন্যে
তুই মা এসেছিলি সিংহ-বাহনে,
তোর দশ হাতের অস্ত্রে ঝলসে উঠেছিল দশ দিক,
তোর অট্টহাস্যে দুলে উঠেছিল স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল,
মহা ভয়করী ভীমা রুদ্রাণী,
তোর চরণের আঘাতে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল
অত্যাচারের অসুর···
অভয়া মা আমার,
তুই তো দুর্বলের জননী নোস্ ?
দুঃখ পেলে যারা ভিখারী হয়,
আঘাত এলে যারা শুয়ে পড়ে,
বেদনাকে যারা করে ভিক্ষার পাত্র,

কড়ির মূল্যে যারা বিকিয়ে দেয় কাহন-কাহন মন,
অভিযোগের মন্ত্রে যারা করে জীবনের উপাসনা,
তাদের পুজো কি মা, পৌঁছোয় তোর পায়ে ?
সংগোপন-দুর্বলতায় কাঁপে যে-কণ্ঠ,
ভীরুতা আর নীচতায় অশুদ্ধ যে-মন,
তার আহ্বান কি মা পৌঁছোয় তোর পায়ে ?

* *

মানুষের অবিচারে সংক্ষুব্ধ হয়ে
রাজ্যহারা রাজা সুরথ একদিন ডেকেছিল তোকে,
একদিন ডেকেছিল তোকে সমাধি বৈশ্য
সর্বহারার আকুতি নিয়ে।
শতবর্ষের রুদ্র তপস্যার অন্তে
তারা পেয়েছিল তোর দেখা।
আর-একদিন নীল সমুদ্রের ধারে
নীলকমল দিয়ে
পুজো করেছিল তোকে
বনবাসী এক রাজার ছেলে।
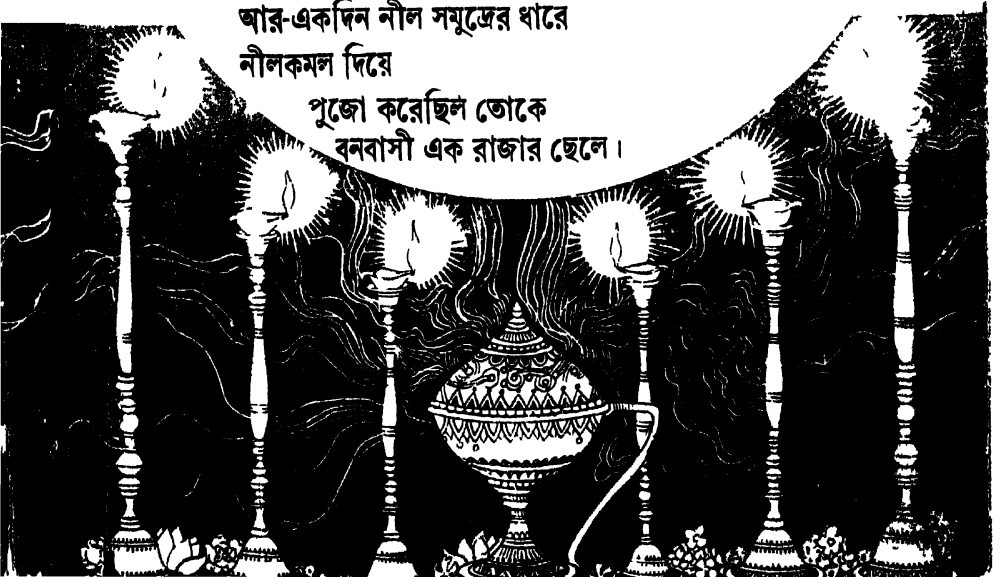
ফুরিয়ে গেল নীলকমল,
তবু সে পায় না তোর দেখা।
তখন তার নিজের নীল-নয়নের কমল উপড়ে ফেলে
দিতে গেল তোর পায়ে অঞ্জলি,
দিলি তুই দেখা······

দেখা দে মা আবার দশভুজে দুর্গে,
দেখা দে মা, বাঙালীর অন্তর-অম্বরে!
রাজা সুরথের তপস্যা নেই আমাদের,
নেই আমাদের সমাধি বৈশ্যের নিষ্ঠা···
নীল নয়ন-কমল কোথা পাবো মা ?
যুগ-যুগান্তের অশ্রুজলে গ'লে গিয়েছে
আমাদের নয়নের নীলা ··
আছে শুধু শতছিদ্রময় প্রাণ···রক্তকমল।

* *

শতাব্দীর রক্ত-সিন্ধুর তীরে
রক্তকমল দিয়ে কে আছো করবে মায়ের পূজা ?

— —

শিব কল্পতরু

স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়েছেন দেবতাবা—ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ সকলে।

মহাশক্তিশালী তারকাসুর স্বর্গ দখল ক'রে নিয়েছে। সমস্ত দেবতা একে-একে তাব ক ''া ''পরাজিত হয়েছেন। ইন্দ্র অবশেষে ক্রুদ্ধ হয়ে তারকাসুরকে বজ্র ছুঁড়ে মারলেন।

ইন্দ্রেব বজ্র, তাবকাসুবেব গলাব কাছে এসে নিস্তেজ হয়ে প'ড়ে গেল। তাবকাসুব জযদর্পে অট্টহাস্য ক'বে উঠলো।

লজ্জায়, ভয়ে, ক্ষোভে দেবতারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে ম্লান-মুখে বায়ুলোকের এক কোণে লুকিয়ে থাকেন।

পৃথিবীব যত লোক দেবতাদের নামে যজ্ঞ করে, দেবতারা সে-যজ্ঞের হবি গ্রহণ করতে পাবেন না! ক্রমশ পৃথিবী যজ্ঞহীন হয়ে পড়ে। অনাচারে ভ'রে ওঠে মেদিনী। তাবকাসুরের অত্যাচারে সমস্ত সৃষ্টি এলো-মেলো হয়ে যায়। দেবতাবা যতবার চেষ্টা করেন তারকাসুবকে বধ করতে, ততবারই তাঁরা নিষ্ফল হন। তখন তাঁরা সকলে মিলে ব্রহ্মাব স্তব কবলেন।

দেবতাদের সেই আকুল স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা বললেন, তারকাসুর আমার বরে তোমাদের অজেয়।

ইন্দ্র বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে বলেন, তাহ'লে উপায়? অসুরই কি হবে র্গের শাসক? সমস্ত সৃষ্টি কি তাহ'লে অসুরের হাতের খেলনা হয়ে থাকবে?

ব্রহ্মা বলেন, একটা মাত্র উপায় আছে। যদি নতুন কোনো দেবতা ন্মগ্রহণ করেন, তবেই তার হাতে তারকাসুর নিহত হতে পারে।

দেবতারা মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়েন, নতুন দেবতার জন্ম কি ক'রে সম্ভব হবে ?

ব্রহ্মা তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, একমাত্র মহাদেবের দ্বারাই তা সম্ভব। কিন্তু সতীর দেহত্যাগের পর তিনি গভীর যোগনিদ্রায় নিমগ্ন হয়ে আছেন। তবে তোমাদের একটা সুখবর জানাচ্ছি, সতী মহাদেবের জন্যেই আবার দেহ ধারণ করেছেন।

দেবতারা একবাক্যে জিজ্ঞাসা [illegible] ওঠেন, কোথায় ?

ব্রহ্মা বলেন, গি[illegible]আবার [illegible] কবে [illegible] কালে তিনি [illegible]ণ করেছেন। পর্ব্বতবা[illegible] দেখা [illegible]ররাজেব গৃহে, মেনকার [illegible]

[illegible]জের কন্যা হয়ে জন্মেছেন ব'লে তাঁর নাম হয়েছে—পা[illegible]ব্বতী।

ইন্দ্র জিজ্ঞাসা কবেন, কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেবেব সেই যোগ-নিদ্রা ভাঙবে কি ক'রে ?

ব্রহ্মা বলেন, সে-দায়িত্ব—পার্ব্বতীব। তোমবা শুধু আড়ালে থেকে পার্ব্বতীকে সাহায্য করো! পার্ব্বতী আব শিবেব মিলনের ফলে আসবে মহাশক্তিশালী এক নতুন দেবতা, দেবতাদের সেনাপতি হয়ে যিনি তাবকাসুরকে বধ করবেন!

দেবতারা সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসেন।

* * *

হিমালয়েব বুকে গিরিরাজের প্রাসাদে স্বর্ণ-ধূলি নিয়ে সখীদের সঙ্গে খেলা করেন পার্ব্বতী। পার্ব্বতীব রূপে আলোময় হয়ে থাকে গিরিরাজের প্রাসাদ। মেনকা-মা এক মুহূর্ত্তের জন্যে স্নেহের কন্যাকে কোলের আড়াল করেন না। পার্ব্বতীর গায়ে যদি একটু সূর্য্যের তাপ এসে লাগে, মেনকা-মা পাগলের মত হয়ে চন্দন-প্রলেপ নিয়ে ছোটেন। খেলা করতে-করতে পার্ব্বতীর কপালে যদি ঘামের বিন্দু দেখা যায়, মেনকা-মা নিজে পুষ্প-পাখা নিয়ে বাতাস করেন। গিরিরাজ আর মেনকার একমাত্র ভাবনা, এমন মেয়ের উপযুক্ত পাত্র তাঁরা কোথায় পাবেন ?

পার্ব্বতীর বিয়ের জন্যে গিরিরাজ চারিদিকে পাত্র খোঁজেন, কিন্তু কোথাও পছন্দ হয় না। এমন সময় একদিন গিরিরাজের প্রাসাদে দেবর্ষি নারদ এসে উপস্থিত হলেন।

নারদের মুখ থেকে গিরিরাজ শুনতে পেলেন তাঁর কন্যার পূর্ব্ব-জন্মের কথা। নারদ বললেন, গিরিরাজ, আপনি অকারণে পার্ব্বতীর বিয়ের জন্যে চিন্তিত হচ্ছেন। পার্ব্বতী হলেন স্বয়ং সতী···আদ্যাশক্তি শিব ছাড়া কোনো দ্বিতীয় পতি তাঁর হতে পারে না। শিবকে পতিরূপে পাবার জন্যেই তিনি আবার জন্মগ্রহণ করেছেন।

দেবর্ষির বাণী শুনে গিরিরাজ কি বলবেন ঠিক করতে পারলেন না। কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে স্নেহশীল পিতার অন্তর উদ্বেল হয়ে উঠলো। কাতর ভাবে নারদকে বললেন, মহর্ষি, লোকে বলে, আমি পাষাণ। কিন্তু তারা দেখতে পায় না এই পাষা[illegible]লে একান্ত স্নেহদ্রব যে প্রাণ রয়েছে। শিব তো শ্মশানচারী, গৃহহীন, উদাসীন···পার্ব্বতী কি ক'রে সে নিদারুণ কষ্ট সহ্য করতে পারবে?

মেনকা সেই কথা শুনে তো মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। মূর্চ্ছা-অন্তে মহর্ষির পা ধ'রে মেনকা কেঁদে বলেন, সে হয় না, সে হতে পারে না মহর্ষি! আমার পার্ব্বতী—ননীর পুতুল। শিব হলো—আগুন! সহ্য করতে পারবে কেন?

নারদ হেসে বলেন, বৃথাই তোমরা ব্যথিত হচ্ছো। ভবিতব্যতার বিধান কেউ খণ্ডাতে পারে না। পার্ব্বতী যেদিন নিজেকে জানতে পারবেন, সেদিন তিনি নিজেই শিবের জন্যে জীবন উৎসর্গ করবেন। শিব আর শক্তি অভিন্ন···অনন্তকাল ধ'রে তাঁরা আছেন···তাঁরা থাকবেন পাশাপাশি।

নারদ গোপনে ক্রীড়ারত পার্ব্বতীর সঙ্গে দেখা করলেন। পার্ব্বতীর কাছে গিয়ে নত হয়ে প্রণাম ক'রে বললেন, মা, ছেলের প্রণাম গ্রহণ কর্!

কিশোরী পার্ব্বতী তো অবাক্! মহর্ষি নারদ, ত্রিকালজ্ঞ ঋষি তাঁকে প্রণাম করছেন?

পার্ব্বতীর মনের ভাব বুঝতে পেরে নারদ বলেন, মাগো, জন্মে-জন্মে তুই যে আমার মা···বিশ্বের মা!

নারদের কথায় অকস্মাৎ জন্মান্তরের রুদ্ধ-দ্বার ভেঙে জোয়ারের মতো জেগে ওঠে গত-জন্মের স্মৃতি। মেনকা-মায়ের বালিকা পার্ব্বতীর অন্তরে জেগে ওঠে আদ্যাশক্তি সতী···শিবের ঘরণী!

পার্ব্বতীকে জাগাবার জন্যেই নারদ এসেছিলেন, কার্য্যসিদ্ধি ক'রে তিনি চলে যান। পার্ব্বতী নিজের ঘরে গিয়ে রাজকন্যার বেশভূষা, স্বর্ণ-রত্ন-অলঙ্কার সমস্ত খুলে ফেলেন। নিরাভরণ স্বর্ণ-দেহে ধারণ করেন—বল্কল। তারপর মেনকা-মায়ের কাছে এসে বলেন, মা, আমাকে অনুমতি দাও, আমি যাবো আমার পতির সন্ধানে!

পার্ব্বতীর সেই তপস্বিনীর বেশ দেখে মেনকা কেঁদে ওঠেন—বলেন, কোথায় যাবি তুই?

পার্ব্বতী শান্তকণ্ঠে বলেন, যেখানে আছেন আমার চিরজীবনের স্বামী, দেবাদিদেব মহাদেব?

মেনকা বলেন, শিব তো জনমানবহীন চির-তু...
নিশ্চল হয়ে ব'সে আছেন। পার্ব্বতীর। ... আচ্ছন্ন কৈলাসে যোগে
পার্ব্বতী তেমনি... আর তুই যাবি কার কাছে?
ধ্যান ভাঙাবার জন্য ...দেবতাদের শান্তকণ্ঠে বলেন, আমিও যাবো কৈলাসে··দেবাদিদেবের
দেবতারা সং... করবো তপস্যা···প্রয়োজন হ'লে তপস্যায় দেবো দেহ বিসর্জ্জন!

মেনকার মুখ থেকে আর্ত্তনাদ জেগে ওঠে, উ মা!

পার্ব্বতী হেসে বলেন, মা, আমাকে বাধা দিতে চেষ্টা কোরো না··এর চেয়ে আনন্দ আমার আর কিছু হতে পারে না!

পিতা মাতাকে প্রণাম ক'রে তপস্বিনী পার্ব্বতী চলেন কৈলাসে। সেইদিন থেকে জগৎ তাঁকে জানে 'উমা' ব'লে।

* * *

ধ্যানমগ্ন শিব। পাহাড়ের শিখরের মত নিশ্চল, নিস্তব্ধ। প্রতিদিন পার্ব্বতী

---

* সংস্কৃতভাষায় তার মানে হলো, না···না···এ কঠোরতা গ্রহণ কোরো না।

প্রতিদিন পার্ব্বতী একান্তমনে ধ্যানমগ্ন শিবের পূজা করেন [পৃষ্ঠা ১৭

একান্তমনে ধ্যানমগ্ন শিবের পূজা করেন। কিন্তু শিবের ধ্যানভঙ্গের কোনো লক্ষণই দেখা যায় না। অনাহারে, উপবাসে শীর্ণ হয়ে আসেন পার্ব্বতী।

যুগের পর যুগ চলে যায়···

ঊর্দ্ধে দেবতারা উৎকণ্ঠায় প্রহর গোণেন। কিন্তু শিব তেমনি নিশ্চল, নিস্তব্ধ!

তখন দেবতাদের পরামর্শে ইন্দ্র মদনদেবকে পাঠালেন, শিবের ধ্যান ভাঙবার জন্যে। মদনের ফুলশর অব্যর্থ, অন্তত মদনের সেই ধারণা ছিল। বীরদর্পে মদন কৈলাসে এসে ধ্যানমগ্ন শিবকে লক্ষ্য ক'রে ফুলশর ত্যাগ করেন।

ফুলশরের আঘাতে ধ্যানমগ্ন শিব একবার চোখ খুলে চাইলেন, দেখলেন, সামনে ফুলধনু নিয়ে—মদন দাঁড়িয়ে। নিমেষের মধ্যে নীলকণ্ঠের অন্তরে জেগে উঠলো দুর্ব্বার ক্রোধ! কপালের মধ্যে জ্বলে উঠলো তৃতীয় নয়ন! সেই তৃতীয় নয়নের বহ্নি-দৃষ্টিতে দেখতে-দেখতে মদন পুড়ে হয়ে গেল অ-তনু!

ঊর্দ্ধে ম্লান বিষণ্ণ-মুখে দেবতারা বুঝলেন, যে-প্রেমে দেবাদিদেব মহাদেবকে জয় করা যায়, সে-প্রেম পারে না জাগাতে মদনের ফুলশর।

মহাদেব আবার নয়ন মুদিত ক'রে ধ্যানে বসলেন।

পার্ব্বতীও বুঝলেন, কঠোর তপস্যা ছাড়া মহাদেবের অনুগ্রহ পাওয়া যাবে না। তপস্যায় করতে হবে তাঁর অন্তর জয়।

তখন পার্ব্বতী আবক্ষ হিমজলে ডুবিয়ে কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। মাথার ওপর দিয়ে নামে তুষার-বৃষ্টির ধারা। তুষারে ক্রমে-ক্রমে জমে যায় দেহ। কোনোরকমে তখন নাক দিয়ে ক্ষীণতম নিশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছেন। অহরহ জপ ক'রে চলেছেন—শিব···শিব···শিব···

সেই কঠোর তপস্যা দেখে দেবতারা পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে ওঠেন। তাঁরা বুঝতে পারেন না, পার্ব্বতী জীবিত আছেন, না সেই তুষারেই সমাহিত হয়ে গিয়েছেন!

অবশেষে একদিন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তপস্যারত পার্ব্বতীর সামনে এসে জিজ্ঞাসা করেন, হে কল্যাণী, তুমি এমন ভাবে কার জন্যে দেহপাত করছো?

পার্ব্বতী বলেন, শিবের জন্যে। শিবই যে আমার পতি।

বৃদ্ধ হেসে ওঠেন। বলেন, তুমি কি উন্মাদ? শিব তো ভিখারী, এত দরিদ্র যে, কাপড় জোটে না…দিগম্বর! আর যেমন রূপ, তেমনি গুণ…অতি বৃদ্ধ! বয়সের গাছ-পাথর নেই! মাথায় সাপ…গলায় বিষ…সর্ব্বক্ষণ নেশায় বিহ্বল! এমন লোককে কোনো মেয়ে স্বামীত্বে বরণ করতে যায়?

বৃদ্ধের কথায় পার্ব্বতীর তপস্যা-শীর্ণ মুখে, দুই চোখে আগুন জ্ব'লে ওঠে। বলেন, বৃদ্ধ, জানি না তুমি কে…তবে তোমাকে আমি মিনতি করছি, আমার সামনে আর শিবনিন্দা কোরো না! তুমি জানো না, শিবই আমার কল্পতরু… জগতের কল্পতরু…শিবের মহিমা তুমি জানো না, তাই এমন অশ্রদ্ধেয় কথা তুমি বলতে পারলে!

দেখতে-দেখতে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মূর্ত্তি অদৃশ্য হয়ে যায়…পরিবর্ত্তে পার্ব্বতী দেখেন, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তুষার-শুভ্র চির-সুন্দর দেব শঙ্কর!

দুই বাহু প্রসারিত ক'রে শিব-শঙ্কর বলেন, এসো পার্ব্বতী, শিবের অন্তরে এসো শিবানী!

তপস্যা থেকে উঠে পার্ব্বতী লুটিয়ে পড়েন শঙ্করের পায়ে!

আকাশ থেকে দেবতারা আনন্দে করেন পুষ্পবৃষ্টি।

এবার আসবে স্বর্গের মুক্তিদাতা—দেব-সেনাপতি।
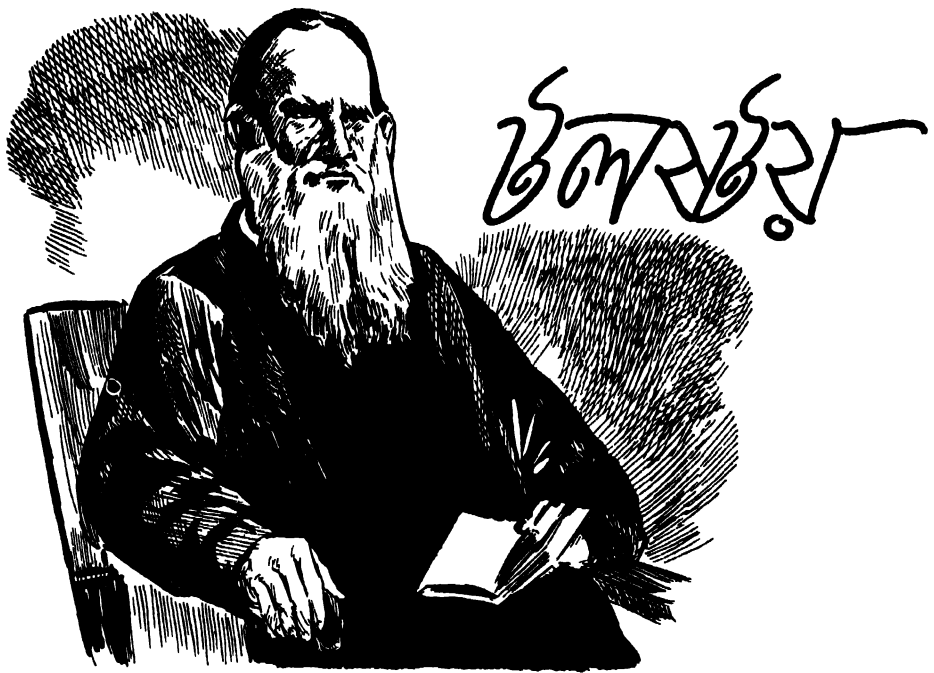
সভ্যতার বর্তমান ইতিহাসের মূল কথা হলো, য়ুরোপীয়-ধারার সঙ্গে য়ুরোপবাদে বিশ্বের জীবন-ধারার সংযোগ, বিয়োগ ও সামঞ্জস্য। বিজ্ঞান সমস্ত পৃথিবীকে আজ একসূত্রে গেঁথে ফেলেছে। তার ফলে প্রাচীন কাল থেকে মানব-সভ্যতার যেসব বিভিন্ন ধারা কখনো-বা পরস্পর খানিকটা কাছাকাছি এসে, কখনো-বা দূরে-দূরে থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছিল, আজকের মানুষের ইতিহাসের ক্ষেত্রে সেইসব বিভিন্ন ধারা এক স্রোতবদ্ধ হয়ে, মানুষের চিরদিনের স্বপ্ন বিশ্ব-পরিবারের আদর্শকে সত্য ক'রে তোলার জন্যে সচেষ্ট হয়েছে। আজকের রাজনৈতিক-বিশ্বকে সামনে রেখে ভাবতে হয়···আজকের অর্থনৈতিককে—বিশ্বের বাজারকে সামনে রেখে অর্থ-পরিকল্পনা করতে হয়···আজকের কবি-ভাবুক-দার্শনিককে—বিশ্ব-মানবের কল্যাণ-চিন্তাকে সামনে রাখতে হয়।

এই বহু-বিভক্ত বহু-বিচ্ছিন্ন বিরাট মানবগ্রহ, অসংখ্য পাঁচিলসত্ত্বেও বাহ্যত আজ এক পরিবারভুক্ত হয়ে পড়েছে।

লোকে বলে, বিজ্ঞান এই অসাধ্য সাধন করেছে। কথাটা আংশিক সত্য। বিশ্ব-পরিবারের এই আপাত-বাহ্যিক নৈকট্য এবং পারস্পরিক বাহ্যিক সংযোগ, আধুনিক বিজ্ঞান না হ'লে সম্ভব হতো না। বিজ্ঞান বাইরের স্থানগত দূরত্বকে দূর ক'রে দিয়েছে, আজকের বৈজ্ঞানিক অর্থ-নীতি ও বাণিজ্য-ব্যবস্থা পৃথিবীর এক প্রান্তবাসী মানুষের স্বার্থকে সুকঠিন ভাবে অপর প্রান্তবাসীর স্বার্থের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে, আজকের রাজনৈতিকেরা বিজ্ঞানের সাহায্যে বিশ্ব-রাষ্ট্র-সংগঠনের উদ্যোগ করছেন। কিন্তু এসব-সত্ত্বেও, আজকের মানুষ মনে-প্রাণে জানে, দু'হাজার বছর আগে এই পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি পরস্পরের কাছ থেকে যত দূরে ছিল, আজও ঠিক ততখানি দূরে আছে, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মনে হয় এই দূরত্ব আরো দুস্তর হয়েছে। বিজ্ঞান এনে দিয়েছে একটা আপাত-নৈকট্য, বাহ্যিক একত্রতার সম্ভাবনাকে। কাছাকাছি, পাশাপাশি বসলেও, দু'জন মানুষ যেমন ট্রামে-বাসে থাকে পরস্পরের মন থেকে শত যোজন দূরে; আজকের এই বৈজ্ঞানিক-বাধ্যতামূলক নৈকট্য হলো তেমনি একান্ত বাহ্যিক ব্যাপার, তাই আজকের রাজনৈতিকদের সৃষ্ট বিশ্ব-রাষ্ট্র-গঠনের পরিকল্পনা হলো, আর-এক বৃহত্তর বিশ্ব-যুদ্ধের তারিখকে,—প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত পিছিয়ে রাখবার চেষ্টা। বিশ্ব-পরিবার, বিশ্ব-মৈত্রী, বিশ্ব-শান্তি প্রভৃতি কথা হলো আজকের পৃথিবীর সাধারণ নাগরিকদের নতুন মস্তিষ্ক-বিলাস। মানুষ যে জিনিস চাইছে, আজকের মানুষ মনে-প্রাণে জানে, সে-জিনিস থেকে সে দূরেই স'রে যাচ্ছে। একত্রতা মানে—একত্ব নয়।

বিশ্ব-পরিবারের অথবা বিশ্বমানবের এই মহা আদর্শ আজ শুধু জন্মেছে মানুষের মস্তিষ্কে। একমাত্র যে পথ দিয়ে এলে এই আদর্শ জীবন্ত সত্যরূপে প্রতিদিনের জীবনের নিয়ামক হতে পারে, আজ পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান ও রাজনীতি সে-পথের সন্ধান জানেনা, জানতে চেষ্টাও করেনা। যে চিন্তা এসেছে মানুষের

মস্তিষ্কে, তা তখনই জীবন-সত্যে পরিণত হবে, যখন তা চিন্তার ক্ষেত্র থেকে আসবে চেতনার ক্ষেত্রে, চেতনার ক্ষেত্র থেকে যাবে উপলব্ধির ক্ষেত্রে। তূলোর আঁশের মতন আমাদের জীবনের মূলে আছে অতি সূক্ষ্ম সব চেতনার আঁশ··· অন্তরের সংগোপন নিভৃত গুহায়···যতক্ষণ না বাইরের চিন্তা সেই অন্তরতম বস্তুর সূক্ষ্মতম আঁশটিকে রাঙিয়ে তুলতে পারছে, ততক্ষণ এইসব বিশ্বগত বড়-বড় আদর্শের কথা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক-মানুষের সুবিধাবাদী মনের আত্মপ্রবঞ্চনার নিদর্শন হয়েই থাকবে।

সে দায়িত্ব একমাত্র নির্ভর করছে—কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও সাধকদের ওপর। বিজ্ঞান যে সুযোগ এনে দিয়েছে, আজকের পাশ্চাত্ত্য রাজনৈতিকেরা তার জঘন্য অপব্যবহার করেছেন এবং করছেন। আজকের পৃথিবীর নায়ক হলো যে-শ্রেণীর রাজনৈতিকেরা, বিশ্ব-চেতনার সেই মহা পরিবর্ত্তন কখনই তাঁদের দ্বারা সম্ভব নয়। মানুষের ভাব ও ভাবনা নিয়ে যাঁরা বেসাতি করেন, তাঁদের ওপর বর্ত্তেছে আজ নতুন দায়িত্ব, তাই নিত্য সংবাদপত্র-স্তম্ভে দেখা যায় বিপ্লব আর বিবর্ত্তনের বিজ্ঞপ্তি।

বহু শতবর্ষ আগে য়ুরোপের এক শ্রেষ্ঠ সন্তান এই বিশ্ব-মানবের স্বপ্ন দেখতে গিয়ে লিখেছিলেন, তিনি যে আদর্শ-রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেছেন, সে রাষ্ট্রের অধিনায়ক বা রাজাকে হতে হবে সত্যিকারের দার্শনিক। প্লেটোকে আমরা ব'লে এসেছি অবাস্তব স্বপ্নদ্রষ্টা—যাঁরা আকাশকুসুমের চাষ করেন তাঁদেরই একজন।

কিন্তু তারপর প্রায় দু'হাজার বছর ধ'রে যাঁরা লোহা আর বারুদ নিয়ে একান্ত বাস্তব ভাবে পৃথিবীর মাটি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ক'রে চষে ফেললেন, তাঁরা সেখানে কাঁটাগাছ ছাড়া আর কিছুই উৎপাদন করতে পারেননি এবং তার জন্যে তাঁরা যে পরিমাণ মানুষের রক্ত আর হাড় সার রূপে ব্যবহার করেছেন, তার হিসেব কেউ রাখেনি এইটেই তথাকথিত বাস্তবতাবাদীদের পরম সৌভাগ্য।

আজকের বৈজ্ঞানিক-সভ্যতায় বিরাট আত্মপ্রবঞ্চনার দিকটা, আজকের পাশ্চাত্ত্য-জীবনধারায় আত্মঘাতী দ্বন্দ্বের অন্তর-বিমুখতা—গত-যুগে যে অতিমানব নিজের

জীবনের অভিজ্ঞতা আর সুগভীর বেদনার ভেতর থেকে বিশ্বগোচর ক'রে গেলেন, তিনি হলেন কাউণ্ট লিও টলষ্টয়, রাশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তান। তাঁর বিচিত্র জীবনের সুগভীর ট্রাজেডী হলো গত-যুগের য়ুরোপের সবচেয়ে বড় এপিক এবং এপিকের মতন তা সকল দেশের সকল মানুষের অন্তর-সম্পদ।

টলষ্টয় নিজে লিখে গিয়েছেন গত-যুগের য়ুরোপের সেই সবচেয়ে বড় এপিক···সে হলো তাঁর নিজের জীবন।

জারের রাশিয়ার অভিজাতশ্রেণীর বিলাসিতার স্বর্গে কাউণ্ট লিও টলষ্টয় জন্মগ্রহণ করেন। বিরাশী বছর বয়সে যখন তিনি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান, তখন তাঁর দেহে ছিল রাশিয়ার সামান্য চাষীর পোষাক, মাথার ওপরে ছিলনা কোনো আচ্ছাদন···তুষারাচ্ছন্ন এক নির্জন রাস্তার ধারে জনহীন এক গেঁয়ো রেল-ষ্টেশনের একপাশে সম্পূর্ণ অজানা একজন সাধারণ রুষ-চাষীর মতন তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখা যায়।

এই প্রবেশ আর নিষ্ক্রমণের মাঝখানে রয়েছে বর্ত্তমান যুগের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক টলষ্টয়ের মহাসাগরের মতন উত্তাল-জীবনের এপিক-ট্রাজেডী। সুদীর্ঘ বিরাশী বছর তিনি জীবন ধারণ করেছিলেন এবং এই দীর্ঘ জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত তিনি সুতীব্র-আত্ম-সচেতন সংগ্রামের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন। বর্ত্তমান যুগের আর কোনো সাহিত্যিকই নিজের দেশে এবং নিজের দেশের বাইরে বিশ্বজগতে এমন সুগভীর রেখাপাত ক'রে যেতে পারেননি। ঊনবিংশ-শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক-সভ্যতার মর্ম্মমূলে যে আত্মঘাতী বিষক্রিয়া ভেতর থেকে মানবীয়-সভ্যতার মূল শিকড়গুলিকে পচিয়ে তুলছিল, টলষ্টয় রুদ্র-সন্ন্যাসীর মত সেই মহাদুর্দ্দৈব সম্বন্ধে মানব-চেতনাকে জাগ্রত ক'রে তোলেন। জারের রাশিয়ায় জারের শাসন আর ব্যক্তিত্ব ছিল ভগবানের মতন অমোঘ···ভগবানের বিধানের মতনই মানবীয় যুক্তির ঊর্দ্ধে ছিল জারের বিধান···সেই জারের রাশিয়াতে বাস ক'রে একমাত্র এই একটি লোক নিজের সুবিশাল ব্যক্তিত্বে জারকে পর্য্যন্ত অবজ্ঞা করতে

পারতেন এবং সে রুদ্র-ব্যক্তিত্বকে জার পর্য্যন্ত রীতিমত ভয় করতেন। পরিণত বয়সে যখন একবার জারের হুকুম নিয়ে পুলিশ-অফিসারেরা তাঁর বাড়ীতে সার্চ করতে আসে, বন্দুক হাতে বৃদ্ধ দরজায় দাঁড়িয়ে গর্জে উঠলেন, জারের হুকুম আমার জন্যে নয়···এক পা যে এই দরজার ভেতরে দেবে তাকেই গুলি করবো···

এই রুদ্রমূর্ত্তি বৃদ্ধকে কিন্তু রাশিয়ার সাধারণ লোকেরা পরম-দেবতার মতন শ্রদ্ধা করতো···অন্তরের প্রিয়জনের মতন ভালোবাসতো। এই বৃদ্ধের উচ্চারিত প্রত্যেক কথাকে তারা বাইবেলের সত্য ব'লে মনে করতো। তাই টলষ্টয়ের প্রভাব যেখানে গিয়ে পৌঁছুতো, জারের প্রভাব সেখানে পৌঁছুতে পারতো না এবং জার সে-কথা জানতেন।

টলষ্টয় যেদিন ঘর ছেড়ে শেষ-যাত্রায় বেরিয়েছিলেন, তাব আগে প্রায় কুড়ি বছর ধ'রে রাশিয়ার সুদূরতম পল্লী আর নগর থেকে প্রায় প্রতিদিন দলে-দলে লোক শুধু এই বৃদ্ধকে একবার দেখবার জন্যে আসতো···শুধু রাশিয়া থেকে নয়, রাশিয়ার বাইরে, য়ুরোপের প্রত্যেক দেশ থেকে জ্ঞানী-গুণীরাও আসতেন এবং এই-সব লোকের সঙ্গে টলষ্টয় যেসব কথোপকথন করতেন, তার প্রত্যেক অক্ষরটি বাশিয়ানরা লিপিবদ্ধ ক'রে রাখতো এবং এইসব সাক্ষাৎকার আর কথোপকথনের ফলে শত-শত লোকের জীবনের ধারা পরিবর্ত্তিত হয়ে গিয়েছে।

কয়েক বছর আগে মস্কোর লাইব্রেরী থেকে গবেষণা ক'রে দেখা হয়েছিল, টলষ্টয় সম্পর্কে জগতের বিভিন্ন ভাষায় এই কয়েক বছরের মধ্যে ২৩ হাজার বই লেখা হয়েছে, য়ুরোপের বিভিন্ন বড়-বড় সংবাদপত্র আর মাসিকপত্রিকায় ৫৬ হাজার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে এবং টলষ্টয় নিজে যা লিখেছেন তা সুবৃহৎ আকারে একশো খণ্ডে রাশিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে।

টলষ্টয় নিজের জীবনে হাজার বাতি জ্বেলে জীবনকে উপভোগ করেছেন···বৃহৎ ভাবে, বিপুল ভাবে, বিস্তৃত ভাবে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে পায়ে মাড়িয়ে দেখেছেন, তার ফলে তাঁকে জীবনের গভীরতম সব প্রশ্নের উত্তর নিজেকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে

আদায় করতে হয়েছে, সে-সংগ্রামের অসহায়তা, সে-সংগ্রামের নিশ্ছিদ্র বেদনার আত্মজ্বালা কি, তা তিনি মর্মে-মর্মে জেনেছিলেন। তাই তিনি পরিণত বয়সে এক ব্রত গ্রহণ করেছিলেন---সাহিত্যের ক্ষেত্রে, জীবনের ক্ষেত্রে যেখানে যে-কোনো তরুণ, অন্তরের সত্যিকারের নিষ্ঠায় অস্তিত্বের প্রশ্নের উত্তর-সন্ধানে আঘাতে-আঘাতে ব্যাকুল হতো, সেখানে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি, সমস্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে সানন্দে উপস্থিত হতেন। এইভাবে তিনি একা ব্যক্তিগত ভাবে বর্ত্তমান যুগের য়ুরোপীয়-চিন্তাধারায় যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তা আজকের য়ুরোপীয়-চেতনায় মিশে আছে। এই ব্রত-উদ্‌যাপনে টলষ্টয় শুধু য়ুরোপের চেতনায় নয়, বিশ্বের চেতনায় তাঁর স্থায়ী চিহ্ন রেখে গিয়েছেন। তাঁর সাক্ষাৎ-পরিচয়ের বাইরে, জগতের দুটি বিভিন্ন দেশে, এ-যুগের দুটি অপরূপ বিশ্ব-মানবের জীবনের চরম সন্ধিক্ষণে যে বন্ধুর স্পর্শ ও প্রভাব টলষ্টয় এনে দিয়েছিলেন, বিংশ-শতাব্দীব অভিব্যক্তিব ধারাকে তা আগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। একজন হলেন রোমা রোলাঁ, আর-একজন হলেন মহাত্মা গান্ধী। রোমাঁ রোলাঁ যেদিন তরুণ ছাত্ররূপে সবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছেন, প্যারিসের এক দরিদ্রপল্লীতে অসহায় আর্ত্ত চিত্ত নিয়ে খুঁজছেন কোথায় পথ, সেইসময় সুদূর রাশিয়া থেকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে তিনি পেলেন যে পরম বন্ধুর স্পর্শ, তার ফলে সেদিনকার সেই অপরিজ্ঞাত ফরাসী-যুবক হলেন—বিশ্বমানব রোমাঁ রোলাঁ। গান্ধীজীর জীবনের ঠিক এইরকম এক আর্ত্ত-লগ্নে, তিনিও রাশিয়ার এই বৃদ্ধ ঋষির আলোক-স্পর্শে তাঁর জীবনের রাজপথের সন্ধান পেয়েছিলেন।

টলষ্টয়ের বিরাট সাহিত্য আর বিদ্রোহী চিন্তাধারা সেইসময়কার য়ুরোপের শিক্ষিত জনসাধারণের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাছাড়া তিনি ব্যক্তিগত-ভাবে তাঁর শেষ জীবনে, এই শতাব্দীর দুটি অপরূপ ব্যক্তিত্বের আত্মবিকাশে প্রত্যক্ষ ভাবে সাহায্য ক'রে গিয়েছিলেন।

রোলাঁ তখন তরুণ। সবেমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা পেরিয়ে সংসারে ঢুকেছেন—দরিদ্র···অসহায়। মনের মধ্যে—সঙ্গীত, শিল্প আর সাহিত্যের নানা রকমের

সুর আর ছন্দ প্রকাশ-ব্যাকুলতায় নীহারিকা-বাষ্পপুঞ্জের মত তীব্রভাবে ঘুরে মরছে··· সেইসব বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী সুরের মধ্যে কোন্ সুরকে তিনি জীবনের পরম আশ্রয় ব'লে গ্রহণ করবেন? তাঁর পথিক-মনের সামনে এঁকে-বেঁকে প'ড়ে রয়েছে নানান্ পথ···কোন্ পথে মিলবে তাঁর অন্তরের পরম-দেবতার দর্শন? সেইসময় দুর্ব্বাসা ঋষির মতন তপস্যা-অমোঘ রুদ্র-অভিশাপ-বাণী নিয়ে য়ুরোপের দূরতম প্রান্ত থেকে টলষ্টয় য়ুরোপের যুগ-সঞ্চিত সাহিত্য আর শিল্প-আদর্শকে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে লিখেছেন, 'What is Art?' শিল্প-প্রয়াসী তরুণ রোলাঁ অন্তরের সমস্ত আগ্রহ নিয়ে পড়েন সেই চরম দুঃসাহসিক গ্রন্থ···সাহিত্যিক হিসাবে টলষ্টয়ের নাম ও খ্যাতি তখন পৃথিবীকে ছাড়িয়ে আকাশকে স্পর্শ করেছে···স্মরণীয়কালের মধ্যে সমগ্র য়ুরোপে এইরকম একটি সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্বের প্রভাব এমন ব্যাপক ভাবে আর দেখা যায়নি···কাল-ভৈরবের প্রতিনিধিস্বরূপ এই রুদ্র-মূর্ত্তি সাহিত্যিকের বক্তব্য সম্পর্কে লোকের সন্দেহ থাকতে পারে···কিন্তু যে ভাবে, যে ভাষায়, যে ভঙ্গীতে টলষ্টয় তাঁর প্রত্যেক উক্তিকে প্রাণ-অগ্নিতে দীপ্যমান ক'রে তোলেন, সে প্রাণ-অগ্নিকে অস্বীকার করা অসম্ভব। বাইবেলের প্রত্যেক উক্তির মত তাঁর প্রত্যেক উক্তির পেছনে কাঁপছে একটা জীবন্ত প্রাণ-সত্তা।··অক্ষর নয়—আগুন! প্রাণের রক্তে লেখা।···শব্দ নয়—বজ্র! প্রদীপের শিখার দীপ্তি নয়—ঝড়ের রাতে আকাশ-চেরা বিদ্যুতের দীপ্তি!

তরুণ রোলাঁ রাত জেগে বারবার ক'রে পড়েন, 'What is Art.' জন্ম-শিল্পীর অন্তর নিয়ে তরুণ রোলাঁ বুঝতে পারেন, যে গ্রন্থ তিনি পড়ছেন, তার প্রত্যেকটি অক্ষর হলো বিদ্যুন্ময়···গ্রন্থের প্রত্যেক লাইনের ভেতর থেকে টলষ্টয়ের পাণ্ডিত্য আর ব্যক্তিত্ব হিমালয়ের মতন পাঠকের দৃষ্টি আর ব্যক্তিত্ব আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে···যতই পড়েন, তরুণশিল্পী ততই যেন কেঁপে-কেঁপে ওঠেন, এবং একে দুর্বার প্রেরণা জাগে;—আজপর্যন্ত যা-কিছু শিখেছেন সমস্ত ভুলে গিয়ে এই বিরাট পুরুষের আদর্শ-সাগরে ঝাঁপাতন। পড়েন···তখনি ভেতর থেকে, অন্তরের অন্তরতমস্থল

থেকে জেগে ওঠে রহস্যময় অশরীরী প্রতিবাদ···তরুণ শিল্পী চোখের সামনে দেখেন, এতদিন অন্তরের সমস্ত ভক্তি আর প্রীতি দিয়ে যে শিল্প-দেবতাদের পূজা ক'রে এসেছেন, এই কাল-ভৈরবের রুদ্র-দূত সেইসব মূর্ত্তিকেই আঘাতে-আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে ফেলতে চেয়েছেন···ওয়াগনার, বিটোফেন, শেকস্‌পীয়ার পর্য্যন্ত বাদ যাননি! ফলে, প্রকাশোন্মুখ তরুণ-শিল্পীর অন্তরে জেগে ওঠে নিদারুণ সমস্যা···শিল্পের—সাহিত্যের। জীবনের আদর্শের এই অনিশ্চিত আলোড়নের মধ্যে কি ক'রে তরুণ মন যাত্রা করবে এই দুরূহ পথে? এই সুতীব্র আদর্শ-সংঘাতে কে দেখাবে তাঁকে পথ?

জীবনের শতছিন্ন দারিদ্র্যের জ্বালা যে-তরুণ-মনকে কাতর করতে পারেনি, আজ জীবনের-যাত্রামুখে অন্তরের দৈন্যের আশঙ্কায় সে ভেঙে পড়ে। প্যারিসের পথে-পথে নারী আর ফুলগন্ধী আবহাওয়ায় তরুণ রোলাঁ দেখেন, নিশ্চিন্ত-নির্ভাবনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে মানুষ-প্রজাপতির দল··কোথায় কার কাছে পাবেন এই তরুণ-মনের জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তর? হঠাৎ নিদ্রাহীন রাত্রিতে সেই অপরিজ্ঞাত তরুণ শিল্পীর মনে এক দুঃসাহসিক আশা জেগে উঠলো, আজ সমগ্র য়ুরোপে যদি কেউ থাকে···মানব-মনের আচার্য্য ব'লে নিসংশয়ে যাঁকে গ্রহণ করা যায়··· তাহ'লে সে ব্যক্তি হলো স্বয়ং টলষ্টয়···কিন্তু এমন সামর্থ্য নেই যে, তাঁর কাছে যাওয়া যায়। তরুণ রোলাঁ ঠিক করলেন, সমস্ত কথা জানিয়ে টলষ্টয়কেই চিঠি লিখবেন। তখনি কাগজ কলম নিয়ে বসলেন। অন্তরের সমস্ত সমস্যার কথা নিবেদন ক'রে, পথ-নির্দেশের ভিক্ষা চাইলেন।

সকালে উঠেই নিজের হাতে সে-চিঠি ডাকে দিলেন। কিন্তু তখনি মনে সংশয় জাগলো, কোথায় টলষ্টয় আর কোথায় প্যারিসের এক এঁদোপড়া গলিতে এক নাম-পরিচয়হীন তরুণ ছাত্র!' এইরকম হাজার-হাজার চিঠি তো প্রত্যেক সপ্তাহে টলষ্টয়ের কাছে যায়···

'তবুও প্রতিদিন তরুণ ছাত্র পিয়নের অপেক্ষায় আকুল ভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন।

পিয়ন দেখলেই ছুটে যান। ··না, না, কোনো চিঠিই নেই। সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে যায়, কোনো উত্তরই আসেনা। প্রাপ্তিস্বীকারটুকুও নয়। তরুণ রোলাঁ অবশেষে উত্তরের আশা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেন, বুঝতে পারেন, এ তাঁর অসম্ভব আশা···যে লোককে একবার শুধু চোখে দেখবার জন্যে শত-শত মাইল দূর থেকে প্রতিদিন শত-শত লোক তীর্থযাত্রীর মতন আসে, একজন নাম-পরিচয়হীন নগণ্য ছাত্রের পত্রগত আবেদন শোনবার সময়ই হয়তো তাঁর নেই···হয়তো শত-শত এইজাতীয় চিঠির মতন তাঁর চিঠি টলষ্টয়ের হাতে গিয়েও পৌঁছোয়নি···সেক্রেটারীরাই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে···

ক্রমশ রোলাঁ একরকম ভুলেই যান সেই চিঠির কথা।

কয়েক সপ্তাহ পরে একদিন ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে দেখেন, তাঁর জানলার তলায় একটা মোটা প্যাকেট প'ড়ে···ডাকে এসেছে। এত মোটা খাম কোথা থেকে কে তাঁকে পাঠালে? নিশ্চয়ই ভুল ক'রে পিয়ন তাঁর জানলায় ফেলে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে দেখেন, অপরিচিত হাতের অক্ষরে প্যাকেটের ওপরে তরুণ ছাত্রেরই নাম···রাশিয়ার ষ্ট্যাম্প···

ভেতর থেকে কেঁপে ওঠে বুক···প্যাকেটের আবরণ ছিঁড়তে গিয়ে আঙুল কাঁপে—তবে কি···?

আবরণ খুলতেই চোখে পড়ে, একতাড়া কাগজে লেখা এক দীঘ, অতি দীর্ঘ চিঠি। চিঠির আরম্ভের দুটি অক্ষর শুকতারার মতন জ্বলতে থাকে, ফরাসীভাষায় লেখা, 'প্রিয়বন্ধু'···

টলষ্টয়ের নিজের হাতে-লেখা চিঠি। চিঠি নয়—বন্ধুর অন্তরের স্পর্শ, সে স্পর্শ বিকশিত ক'রে তুললে আজকের শতাব্দীর অন্যতম সবশ্রেষ্ঠ মনকে···

টলষ্টয়ের সেই সুদীঘ চিঠি তরুণ রোলাঁর অন্তরের সমস্ত দ্বিধা দূর ক'রে দিলে। তরুণ রোলাঁ ভাবতেই পারেননা, তাঁর মতন একজন নগণ্য তরুণ ছাত্রের জন্যে টলষ্টয়ের মতন মহামানব এতখানি আন্তরিকতা আর শ্রদ্ধা দিয়ে

এমন সুদীর্ঘ চিঠি লিখতে পারেন। সেই সুদীর্ঘ চিঠির প্রত্যেকটি অক্ষর অন্তরতম বন্ধুর প্রাণস্পর্শের মত তরুণ শিল্পীর অন্তরে এনে দিলে আত্মবিশ্বাস, এনে দিলে সংকল্প, এনে দিলে অন্তরের সত্যকে অনুসরণ করবার অভিনব বীরত্ব। সত্য আর কল্যাণ-অন্বেষী টলষ্টয়ের মনের জ্বলন্ত শিখা, তরুণ রোলাঁর মনেও জ্বালিয়ে তুললে জীবন-সত্যের পাবকশিখা।

ঠিক এমনিভাবে বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদে আফ্রিকায় একজন আদর্শবাদী তরুণ ভারতীয় ব্যারিষ্টার নিজের স্বদেশ থেকে দূরে, উদ্ধত বিদেশী-শাসকদের অত্যাচার আর পীড়নের মধ্যে, ব্যক্তিগত জীবনের নানা পরস্পর-বিরোধী আদর্শের সংঘাতের মধ্যে, নিশিদিন আকুল-ভাবে খুঁজছিলেন—কোথায় পথ? চারিদিকের এই পরস্পর-বিরোধী বাস্তবতার অন্ধকারে কোথায় জীবনের ধ্রুব-পথ? তরুণ গান্ধী ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে অন্বেষণ করেন, বিভিন্ন শাস্ত্র, বিভিন্ন ধর্ম্ম, বিভিন্ন মতবাদ আর অনুষ্ঠানের মধ্যে কোন্ জীবন-সত্যকে তিনি জীবনের পরম-নিয়ামক রূপে গ্রহণ করবেন?

এই সংশয়, দ্বিধা, আগ্রহ আর আকুলতার মধ্যে তরুণ গান্ধীর হাতে একদিন এসে পড়লো টলষ্টয়ের একখানি বই, 'The kingdom of God is within us.' সেই বইয়ের বক্তব্য বিষযের চেয়ে যে-জিনিসটা তরুণ গান্ধীর মনে বিস্ময়কর ভাবে প্রভাব বিস্তার করলে, সেটি হলো এমন অবিচল বিশ্বাস, এমন জীবন-বোধ, এমন অগ্নিদীপ্ত প্রত্যয়, যে, তিনি আর কখনো এ-যুগের লিখিত-সাহিত্যে দেখেননি। তরুণ গান্ধী নিঃসংশয় ভাবে বুঝলেন, এই একটি লোক যে-কথা বলছে, তার প্রত্যেকটি কথা সে জীবনের চরম সত্য ব'লে বিশ্বাস করে, প্রত্যেকটি কথা তার মানবীয় অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধির রক্ত-রঙে রাঙা। তরুণ গান্ধী মনে-মনে খুঁজছিলেন এমনি অবিচল উপলব্ধির-বাণী...খুঁজছিলেন এমনি একটি সত্যান্বেষী সংগ্রামী মন...যে জগতের সমস্ত প্রতিবাদকে তুচ্ছ ক'রে বলতে পারে... জীবনের কাদা-মাটি, ব্যথা-বেদনাকে অনুতে-অনুতে অনুভব করে...আমি দেখেছি জীবনের অবগুণ্ঠন মোচন ক'রে তার সত্য রূপ।

গান্ধীজী সংগ্রহ ক'রে টলষ্টয়ের অন্য-সব লেখা পড়লেন; আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন—মনে-মনে তিনি সংগ্রামের যে নব-কর্মপন্থা স্থির করছেন, রাশিয়ার এই মহামানব সেই পন্থাকেই একমাত্র অন্তর-ধর্মানুমোদিত ব'লে গ্রহণ করছেন এবং তারই বাণী নির্ভীক ভাবে প্রচার ক'রে চলেছেন। সেই নব-কর্মপন্থার নাম দিয়েছেন তিনি, 'Passive Resistance.' টলষ্টয়ের মধ্যে তরুণ গান্ধী খুঁজে পেলেন তাঁর একক-পথের যাত্রা-সহচর, অন্তরের পরমাত্মীয়। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গান্ধীজী পত্রযোগে রাশিয়ার ঋষির সঙ্গে সম্পর্ক গ'ড়ে তুললেন এবং ফিনিক্স্ থেকে ট্রানস্ভালে এসে তিনি নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ করবার জন্যে টলষ্টয়ের আদর্শে এক ধর্ম-নিকেতন গ'ড়ে তুললেন, তার নাম দিলেন—'টলষ্টয় ফার্ম'। সেখানকার সমস্ত ঘটনা আর কার্য্যাবলীর নিয়মিত সংবাদ গান্ধীজী টলষ্টয়কে পাঠাতেন এবং টলষ্টয় সুগভীর নিষ্ঠা আর শ্রদ্ধায় তরুণ গান্ধীর প্রত্যেক সমস্যার ও প্রশ্নের উত্তর দিতেন। Kotchety থেকে লেখা, ১১৯০ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের টলষ্টয়ের যে দীর্ঘ পত্র সৌভাগ্যবশত সংরক্ষিত আছে, তাতে দেখা যায়, রাশিয়ার সেই অশীতিপর বৃদ্ধ-ঋষি কিরকম আন্তরিকতার সঙ্গে গান্ধীজীকে অনুপ্রেরিত করেছেন এবং সেই ঐতিহাসিক-পত্রের শেষের দিকে টলষ্টয় অভ্রান্ত ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার মতন সর্বপ্রথম গান্ধীজী সম্বন্ধে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন:

"...your (Gandhiji's) activity in the Transval, as it seems to us, at this end of the world, is the most important of all the work now being done in the world, wherein not only the nations of the christian, but of all the world will unavoidably take part."

১৯১০ সালে যে ব্যক্তি গান্ধীজী সম্বন্ধে এইরকম ভবিষ্যৎবাণী করতে পেরেছিলেন, তাঁর সম্পর্কে স্বাধীন-ভারতের তরুণদের একটা কৃতজ্ঞতা-ঋণ পরিশোধ করবার আছে। স্বাধীন ভারতের অন্তরের অন্তঃপুরে রাশিয়ার এই ঋষি

পরমাত্মীয়ের মতন বিরাজ করছেন। জানিনা, আজকের যুগের তরুণেরা নভেল-লেখক টলষ্টয় ছাড়া সেই মানুষ টলষ্টয়কে চেনেন কিনা!

রোমা রোলাঁ বিশ্বজয়ী খ্যাতি অর্জন করার পর, জীবনের অন্যতম দীক্ষাগুরু টলষ্টয়ের প্রতি তাঁর ঋণকে স্বীকার ক'রে যান টলষ্টয়ের জীবনী লিখে।

রোলাঁ তিনখানি অপরূপ জীবনী লেখেন। একটি হলো মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর, অপরটি হলো বিটোফেনের 'আর তৃতীয় হলো টলষ্টয়ের। যদিও তিনি পরে গান্ধীজী ও ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর বিবেকানন্দের জীবনী লিখেছেন, কিন্তু সাহিত্যের দিক দিয়ে তার প্রথম তিনখানি জীবনীকে Tritogy বলা যায়, একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এই তিনটি জীবনী লিখেছেন। মাইকেল এ্যাঞ্জেলো, বিটোফেন আর টলষ্টয় বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে জন্মেছেন, তাঁদের প্রতিভার প্রকাশও বিভিন্ন। কিন্তু রোলাঁ এই তিনটি অপরূপ শিল্প-স্রষ্টাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে একই জীবন-রসের বিকাশকে অনুসরণ করেছেন, সে জীবন-রস হলো—মহা-বেদনা, tragedy. এই তিনজন বিশ্ব-প্রতিভার জীবনই হলো tragedy-র মহা-লীলা। রোলাঁ এই তিনজনের ভেতর দিয়ে জীবনের অন্তর্নিহিত tragedy-র তিনটি বিভিন্ন প্রকাশকে ফুটিয়ে তুলেছেন। মাইকেল এ্যাঞ্জেলোর জীবনের বেদনার বীজ ছিল তাঁর নিজের প্রকৃতির মধ্যে, সারা জীবন ধ'রে তিনি নিজের সঙ্গে, নিজের ছায়ার সঙ্গে, নিজের প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে গিয়েছেন, বিটোফেনের ট্রাজেডীর বীজ ছিল তাঁর নাগালের বাইরে রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় অদৃশ্য শক্তির মধ্যে নিহিত, যাকে আমরা সাধারণ ভাষায় বলি, ভাগ্য বা দৈব…জগতের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার হবেন, জীবনের মধ্য-পথে ভাগ্য এনে দিলো তাঁকে প্রস্তর-বধিরতা, টলষ্টয়ের জীবনের tragedy হলো—পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মানুষের অন্তরের চিরন্তন সংগ্রাম, অন্তরের ধর্মের সঙ্গে বাস্তবতার বিরোধিতার সংগ্রাম, চাওয়া ও পাওয়ার epic-সংগ্রাম। রোমা রোলাঁ অপরূপ ভাবে টলষ্টয়ের জীবনের এই মর্মান্তিক আত্মসংগ্রামের tragedy ফুটিয়ে তোলেন।

টলস্টয়ের জীবনের এই epic-সংগ্রাম হলো, আজকের
জাগ্রত-মানুষের অন্তর ও বাহিরের মীমাংসাহীন অন্তর্দ্বন্দ্বের একট
একটা পুরনো পৃথিবী, তার ধর্ম, আচার, প্রথা, অভ্যাস
পড়েছে···তার সামনে জাগছে বিজ্ঞান-বিশ্বামিত্রের নির্দেশে আর-
নতুন তার ধর্ম, নতুন তার প্রথা, নতুন তার মূল্যমান। পুরনো
পরিচিত, নতুন পৃথিবীর পূর্ণ পরিচয় তখনো মানুষ পায়নি, কারণ,
গ'ড়ে উঠেছে। এই দুই পৃথিবীর দুই সম্পূর্ণ বিপরীত মূল্যমানে
গোধূলি-লোকে টলস্টয় আবির্ভূত হয়েছিলেন। গত-শতাব্দীর পাশ
ও মনে যে বিপুল অসঙ্গতি আর ভাব-বিরোধের সংঘর্ষ চলছিল,
মন হলো সেই ঐতিহাসিক-সংঘর্ষের একটা জীবন্ত প্রতীক। ঊনবি
প্রান্তরে টলস্টয়ের জীবনকে দেখি, প্রান্তর ভেদ ক'রে উঠেছে
সেই পর্বতের নিম্নদেশ—প্রান্তরের মাটিতে প্রোথিত, সেখানকার আ
আবহাওয়ারই আত্মীয়···কিন্তু পর্বতের শৃঙ্গদেশে এসে পড়েছে
নতুন আলো, সেখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে নেই প্রান্তরভূমির
টলস্টয় জন্মেছিলেন ঊনবিংশ-শতাব্দীর ঐশ্বর্য্য, প্রাচুর্য্য আর বিলা
···তাঁর জীবনের শেকড় ছিল, নিঃশেষিত-বীর্য্য ঊনবিংশ-শতা
ভোগের মাটির তলায়···কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি রক্তকণিকায়
এনেছিলেন তার সুতীব্র প্রতিবাদ। তার জীবন যত এগিয়ে চ
সুতীব্র ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে এই অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব···অব
সুরু হয়ে যায় এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির প্রাণান্ত সংগ্রাম··
সংগ্রামের ক্ষেত্র হলো তাঁর নিজের মন। মৃত্যুতে শেষ হলো এ
এবং সে-মৃত্যু অমর-বিজয়ের মত বিংশ-শতাব্দীর ঊষা-কালকে ক
এক নতুন প্রাণের আলোয় দীপান্বিত।

জারের রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ এক ধনী-অভিজাতের প্রাসাদে

সব আয়োজনই
য় সব স্বাদ।
জেগে উঠলো,
ঘুরতেন-ফিরতেন,
দিকে···দেখলেন,
দাঁড়ালে জীবনের
র ব'সে কাঁদছে
ক্ষাক্ত নখ-দন্ত,
, সঙ্গীত, সংবাদ-
ই ক'রে চলেছে
ননা, তার এই
·ব্যাধিগ্রস্তই হয়,
র তার শিখাময়ী
ান। টলস্টয়ের
প্রাণ-শিখা!
জেগে উঠলো,
এত সুবিপুল
উপকরণ, এত
তনা?
কাহিনী শোনেন,
ইরের গিল্‌টি-করা
জরাগ্রস্ত দেহ ও

পরমাত্মীয়েব মতন খানে জন্মেছিলেন, তাব চতুঃ-সীমানার মধ্যে কখনো ভুলেও প্রবেশ
লেখক টলষ্টয় ছাড়া এই পৃথিবীর সাধারণ মানুষের হাসি-কান্নার সুর। যে-প্রাসাদে
রোমা রোলাঁ ছিল সোনালী-রূপালী-কাজকরা দেয়ালওয়ালা বিয়াল্লিশটা প্রকাণ্ড
টলষ্টয়ের প্রতি তাঁ যেদিন তিনি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন, সেদিন তিনি
রোলাঁ তিনথাবণ করলেন এক গেঁয়ো-পথের ধারে, পথের ওপরে···তাঁর অঙ্গে
অপরটি হলো বিদ্রে চাষীদের পোষাক, সঙ্গে ছিলনা একটিও পেনী।
গান্ধীজী ও ঠাকুর নি আকাশে প্রদীপ জ্বালিয়ে জীবনকে ভোগ করেছেন, কোনো
দিক দিয়ে তাব প্রথ,ভলের নায়কের ভাগ্যে সে ভোগ-বৈচিত্র্যের বিপুলতা ঘটেনা।
উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি স্পর্শ, ইত্যাদি মানুষকে যা দিতে পারে ঐহিক আনন্দ—নির্লজ্জের
আর টলষ্টয় বিভিন্ন জীবন থেকে আদায় ক'বে নিয়েছেন, না পেলে ঝগড়া করেছেন,
বিভিন্ন। কিন্তু রোদ্ধ করেছেন, প্রয়োজন হ'লে—খুনও করেছেন। ভোগের একটি
একই জীবন-বসের জন্যে কোনো পাপের দুশ্চিন্তা তাঁকে কাপুরুষ করতে পারেনি।
tragedy. এই তিতাঁর সেইসব ভোগ-বৃত্তির কথা অকপট ভাবে লিখে রেখে
রোলাঁ এই তিনজনে
প্রকাশকে ফুটিয়ে তু কলেজে অধ্যাপকেরা সেই সুরামত্ত ছাত্রের মস্তিষ্কে পুঁথিগত
তাঁর নিজের প্রকৃতিবানো সূত্রই অনুপ্রবিস্ট করাতে পারেননি, বহু চেস্টার পর হতাশ
সঙ্গে, নিজের প্রকৃতিয়া দিয়েছেন—এ-জাতীয় স্বর্ণ-গর্দ্দভের দ্বারা লেখা-পড়া শেখা
ছিল তাঁর নাগালের কিন্তু সেই অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে টলস্টয় রেখে গেলেন শতাব্দীর
আমরা সাধারণ ভাষপনিষদ। টলষ্টয়ের বিশাল সাহিত্য, মানবতার চির-সম্পদ।
হবেন, জীবনের মকীটস্ একদিন এক আত্মভোলা মুহূর্ত্তে বলেছিলেন, আমি সারা রাত
জীবনের tragedy খবো, কোন্ মুহূর্ত্তে কুঁড়ি হয়ে ওঠে ফুল! আজও মানুষ তার
অন্তরের ধর্মের সঙ্গে যন্ত্রপাতি নিয়ে ব'সে আছে, দেখবে ব'লে, কোন্ প্রক্রিয়ায় মানুষের
সংগ্রাম। বোমা ব্যক্তিত্বের রূপান্তর, কোন্ দিব্য-মুহূর্ত্তে মানুষের গহন চেতনায়
আত্মসংগ্রামের tragঠে ফুল, আসক্তির আসবে কখন কিভাবে মুছে যায় নেশার
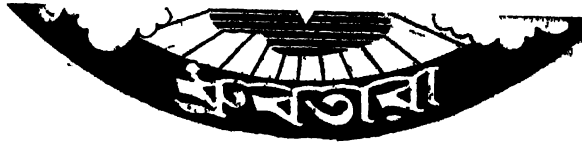
রঙ্, সুরার পাত্রে মিশে যায় অশ্রুর লোনা জল,—নিশ্চিন্ত ভোগের সব আয়োজনই থাকে, ইন্দ্রিয়ও থাকে সব সজাগ, তবু ভোগ থেকে কে কেড়ে নেয় সব স্বাদ!

জীবনের উন্মত্ত চলার মধ্যে একদিন সহসা টলষ্টয়ের মনে জেগে উঠলো, জিজ্ঞাসা···নিজের জীবনকে ছাড়িয়ে যে-সমাজের মধ্যে এতদিন ঘুরতেন-ফিরতেন, সেই সমাজের বাইরে চেয়ে দেখলেন, চলমান মানুষের জীবনের দিকে···দেখলেন, উনবিংশ-শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক-সভ্যতার ভদ্রবেশী সৌখীন সচলতার আড়ালে জীবনের পঙ্গু পক্ষাঘাতগ্রস্ত ভয়াবহ দৈন্য আর অসঙ্গতির রূপ, প্রাচুর্য্যের অন্তরে ব'সে কাঁদছে ছিন্নকন্থা রিক্ততা, ভব্যতার আড়ালে লুকিয়ে আছে বন্যপশুব রক্তাক্ত নখ-দন্ত, সভ্যতার নামে চলেছে মানবতার অপমান। বিজ্ঞান, সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, সংবাদ-পত্র—প্রত্যেকের মুখে মানবতার জয়গানের উচ্ছ্বাস, কিন্তু প্রত্যেকেই ক'রে চলেছে প্রাণহীন স্বর্ণের ক্রীত-দাসত্ব, মানবতার অপমান। মানুষ জানেনা, তার এই সভ্যতাই হয়ে উঠেছে তার চরম ব্যাধি!

টলষ্টয়েব জীবনে এলো মহাবিপর্য্যয়, যদি এই সভ্যতা—ব্যাধিগ্রস্তই হয়, সে-ব্যাধির প্রতিকাব কি? কোথায় মানুষের অন্তবের সত্য-প্রকাশ আব তার শিখাময়ী প্রাণ-বাণী?

টলষ্টয়ের পরবর্ত্তী সমগ্র জীবন হলো এই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধান। টলষ্টয়ের বিরাট সাহিত্য হলো তার বাণী-রূপ। বাণী নয়, শুধু অন্তরেব প্রাণ-শিখা!

জীবনের পবিপূর্ণ ভোগের ভেতর থেকে টলষ্টয়ের মনে জেগে উঠলো, জিজ্ঞাসা—আত্ম-জিজ্ঞাসা। যে-সুখ, যে-আনন্দের জন্যে জীবনের এত সুবিপুল সমারোহ, কোথায় অন্তরে সে-সুখের স্পর্শ? এত আয়োজন, এত উপকরণ, এত সমারোহসত্ত্বেও কেন জীবনে এলোনা আনন্দের সেই নিবিড়-ঘন চেতনা?

নিজের জীবনের বাইরে সহযাত্রী অভিজাত-শ্রেণীদের মর্ম্ম-কাহিনী শোনেন, সেই এক শোচনীয় আনন্দহীন পরাজয় আর ব্যর্থতার কাহিনী। বাইরের গিল্‌টি-করা চাকচিক্যের 'সব ঠিক-আছে'র আড়ালে অন্ধকারময় একা-ঘরে কাঁদে জরাগ্রস্ত দেহ ও

মন···তবু কামনার নেই শেষ···নিজের ঘরের সুন্দরী স্ত্রীকে অবজ্ঞায় দূরে রেখে, মোহগ্রস্তের মতন বিপথে ছোটাছুটি · সকল ছোটাছুটির পরিণাম, শক্তিহীন অসাড় দেহে অনির্বাণ কামনার বিষাগ্নি-জ্বালা!

কোথায় এই উন্মত্ত ভোগের শান্ত অবসান? কোথায় এই কোলাহলের মধ্যে শুদ্ধ স্বচ্ছ সত্যবাণীর প্রকাশ? টলস্টয় চেয়ে দেখেন সারা পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতার দিকে···সেই এক অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যহীন কোলাহলময় গতির সুসভ্য আত্ম-প্রতারণা! জীবনের পাত্র উপ্‌চে পড়ে শুধু ফেনায়, পাত্রের তলায় যা প'ড়ে থাকে, তাতে হয়না তৃষ্ণা দূর!

কোথায় জীবনের কোন্ সংগোপন গভীর মর্ম্মমূলে লুকিয়ে আছে সেই অমৃত-রস, যার অদৃশ্য নিঃশব্দ সঞ্চরণে গাছ ফেটে পড়ে মুকুলে—মুকুল ফুটে ওঠে ফুলে-–ফুল ঝ'রে যায় ফলের পরিপূর্ণ সার্থকতায়? কোথায় জীবনের সেই আনন্দ-মর্মমূল?

পাশ্চাত্ত্য যান্ত্রিক-সভ্যতার আপাত-আড়ম্বর আর ঐশ্বর্য্যের বহিরাবরণ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে টলস্টয় দেখালেন তার ভেতরকার ভয়াবহ রিক্ততা। সন্ধ্যার ঘণ্টা-ধ্বনির মতন তাঁর প্রৌঢ়-সাহিত্যে বেজে উঠলো রিক্ত-প্রাণ আধুনিক-সভ্যতার দিবাবসানের সুর। ঋষি দুর্ব্বাসার মতন স্পষ্ট বজ্রভাষণে মানুষকে ডেকে বললেন, "আজ প্রবলের রূপে যাকে দেখছো রাজনীতিতে, সমাজধর্মে, সাহিত্যে, সংবাদপত্রে—সে প্রবল হলেও, সে অন্যায়। অন্যায়, কারণ তা মানবতা-বিরোধী···আনন্দ-বিরোধী···কল্যাণ-বিরোধী। এই প্রতিষ্ঠিত প্রবল অন্যায়ের বিরুদ্ধে দীনতম মানুষের বুকে এখনো জাগ্রত আছে সেই শুভ্র শক্তি, যাকে উদ্বোধন ক'রে অতি-সাধারণ মানুষও এই পৃথিবীর ভাগ্য-বিধানে নিতে পারে তার ন্যায্য অংশ। তাই আজ প্রতি মানুষকে সজ্ঞানে এবং সবলে করতে হবে এই প্রতিষ্ঠিত প্রবলের বিরুদ্ধে অসহযোগ। এই নিষ্ক্রিয় অসহযোগের তপস্যার ভেতর থেকে নতুন ক'রে জন্মাবে মানুষের চেতনায় নব-কর্মশক্তি, নতুন স্তরে মানুষ আবার নিজেকে করবে উন্নীত···

সাহিত্য ও জীবনের মধ্যে ঘটে গিয়েছে যে বিচ্ছেদ, অন্তরের সত্য-সাধনায় ঘোচাতে হবে সে মারাত্মক ব্যবধান। সাহিত্য হবে চিরন্তন-জীবনের শিখাময় মন্ত্র। জীবন হবে সত্যের শিখায় জ্যোতিষ্মান্।"

নিজের জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে লাগলো এই আদর্শের বিরোধ। যাকে চেতনায় জেনেছেন চরম সত্য ব'লে, প্রতিদিনের জীবনে দেখেন তারই প্রতিবাদ। নিজে প্রচার করছেন ব্যক্তিগত-শ্রমের মহিমা, অথচ নিজে ভোগ করছেন অনার্জিত-জমির উপস্বত্ব। চেতনায় উপলব্ধি করেছেন বাহুল্যবিহীন অনাড়ম্বর সহজ জীবনের মহা-ঐশ্বর্য্য, অথচ তিনি নিজে বাস করেন উপকরণ-বহুল প্রাসাদের আড়ম্বরের মধ্যে। অন্তর দিয়ে বুঝেছেন, ব্যাভিচারের চিন্তাও ব্যাভিচার, অথচ রক্তকণিকায় মহা-নিঃশব্দে আজও ঘুরে বেড়ায় তৃষ্ণার্ত্ত কামনার বীজ, আজও প্রতি-মুহূর্ত্তে কঠিনা স্বামীনীর মত পরিণীতা স্ত্রী আবিল ক'রে তোলে জীবনের স্বচ্ছন্দ-স্রোত—নারী-জনোচিত সুখ-সৌভাগ্যের দাবীতে। প্রৌঢ় টলষ্টয়ের জীবন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ওঠে এই আত্মসংগ্রামে, সংকল্প করেন, মহা-নির্মমের মত নিজের হাতে নিশ্চিহ্ন ক'রে যাবেন এই চেতনা আর বাস্তবতার দ্বন্দ্ব।

যে-পন্থা অনুসরণ ক'রে আমাদের দেশে, যুগ-যুগ ধ'রে সচ্চিদানন্দ-প্রয়াসী মানুষ এই অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্বকে আত্মচেষ্টায় প্রশান্ত করতেন, যে-কর্ম-কৌশল অবলম্বন ক'রে তারা আত্মজয়ী হতেন, দুর্ভাগ্যবশত টলষ্টয় তার বিপরীত পরিবেশের মধ্যেই মানুষ হয়েছিলেন, তাই তাঁর এই আত্মজয়ের নিদারুণ সংগ্রাম, মানবীয়তার এক অপরূপ করুণা আর বেদনার ট্রাজিক দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের সম-সাময়িক ইতিহাসের ভাণ্ডারে রয়ে গেল।

বুদ্ধের আত্মজয়ের সাধনাকে আমরা বলি—তপস্যা; টলষ্টয়ের আত্মজয়ের সাধনা হলো—সংগ্রাম।

এবং সংগ্রাম বলেই তাঁর মানবীয়তা আজকের মানুষের কাছে একটা স্বতন্ত্র মূল্য এনে দিয়েছে।

নিজের অন্তরের বিরোধের চেয়ে কুৎসিততর বিরোধ লাগলো, বাইরে—টলষ্টয়ের নিজের সংসারে, এবং সকলের চেয়ে বেদনার বিষয়, নিজের স্ত্রীর সঙ্গে। একদিন যে-স্ত্রীর প্রেমে তিনি নতজানু হয়ে প্রকাশ্য গির্জায় প্রার্থনা করেছিলেন, 'ভগবান, এই প্রেম যেন চিরদিন এমনি আকুল থাকে।'

কিন্তু যতই টলষ্টয়ের জীবনের আদর্শ-গত পরিবর্ত্তন ঘটতে লাগলো, ততই স্ত্রীর সঙ্গে সংঘর্ষ কঠোর হয়ে উঠতে লাগলো। অভিজাত কাউণ্টেস, সুরামত্ত স্বামীর লাম্পট্য সহ্য করতে পারেন, কিন্তু সেই স্বামী যদি সন্ন্যাসী হতে চায়, তাহ'লে নারীর সমস্ত আত্ম-রক্ষিকা সংস্কার মারমুখী হয়ে ওঠে। লম্পট স্বামী রাত্রি শেষে যখন অভিমানিনী স্ত্রীর শয়নকক্ষে ফিরে আসে, তখন সমস্ত অভিমান আর ক্রোধ-সত্ত্বেও স্ত্রী জানে, তুমি যেখানেই যাও তুমি আমার! আমাব কাছে ফিরে তোমায় আসতেই হবে; কিন্তু স্বামী যখন দীক্ষা নিতে চায় বৈরাগ্য-মন্ত্রে, স্ত্রীর সমস্ত নারীত্ব তখন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে, যেখানে হাজার-হাজার বছরের নারীর মূক—বশ্যতার ঐতিহ্য, সেখানেও নারী অসহায়-কান্নায় প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য-জগতে, যেখানে নারীর নেই সেই পুরুষবশতার ঐতিহ্য, বিশেষ ক'রে সে-নারী যদি ধনী কাউণ্টের স্ত্রী এবং অভিজাত সমাজ-নেত্রী হন, তাহ'লে সে-নারী হয় তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করবেন স্বামীর পরিবেশে নিজের অভ্যস্থ স্থানকে বজায় রাখতে, অথবা স্বামীকে পরিত্যাগ করতে। কাউণ্টেস্-টলস্টয় জগৎ-বিখ্যাত স্বামীকে পরিত্যাগ করতে চাননি, তিনি চেয়েছিলেন কাউণ্টেস্-টলষ্টয় রূপে স্বামীর জীবনে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে, রাশিয়ার সর্বোচ্চ অভিজাত-সমাজে তাঁর যোগ্য মর্য্যাদার স্থানে প্রতিষ্ঠিত থেকে জীবন উপভোগ করতে। যে-স্বামীকে তিনি আযৌবন দেখেছেন সাধারণ অভিজাত-ভোগীর রূপে, জীবনের উপান্ত-সীমায় হঠাৎ তাঁর মধ্যে অভিজাত-সমাজ-বিরোধী সুতীব্র বৈরাগ্য আর দারিদ্র্যধর্মী ধার্মিকতাকে দেখে তিনি বিশ্বাস করতেই পারলেননা এই পরিবর্ত্তনের আন্তরিকতা। সাধারণ নারীর মতনই তিনি এই বিরাট আত্মিক-পরিবর্ত্তনকে পরিপূর্ণ অশ্রদ্ধাই শুধু করলেননা, বিক্ষুব্ধ নারীত্বের সমস্ত জ্বালা নিয়ে

টলস্টয়ের প্রতিদিনের জীবনকে প্রতিবাদে-প্রতিবাদে কণ্টকিত ক'রে তুললেন এবং ক্রমশ এই প্রতিবাদ এমন একটা উন্মাদ আক্রোশের রূপ ধারণ করলে যে, যার ফলে, স্বামী-স্ত্রী এক বাড়ীতে থাকতে বাধ্য হয়েও পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যকে বিষবৎ পরিত্যাজ্য মনে করতেন। এই তিক্ততা যে কতখানি মর্মান্তিক হয়ে উঠেছিল তা বোঝা গেল যখন টলস্টয়ের মৃত্যুর পর তাঁর উইল প্রকাশিত হলো। সেই উইলে টলস্টয় লিখে গিয়েছিলেন, তাঁর মৃতদেহ যখন সমাহিত করা হবে, তার ত্রিসীমানায় যেন তাঁর স্ত্রীকে না আসতে দেওয়া হয়।

টলস্টয়ের অন্তরে নতুন আলোয় জেগে উঠলো—যীশুর জীবন-বাণী। জেরুজালেমের সেই দীনতম ছুতোরমিস্ত্রীর ছেলের জীবন ও বাণী, উনবিংশ-শতাব্দীর যান্ত্রিক-সভ্যতা আর বাণিজ্যিক-খ্রীষ্টানীর যুগে টলস্টয়ের মনে নতুন জীবন-বেদের দীপ্তি উদ্ভাসিত ক'রে দিলে। তিনি সংকল্প করলেন, অভ্যস্ত-জীবনের বিলাসিতা আর উপকরণ-বহুলতা পুড়িয়ে দিয়ে তিনি পৃথিবীর দীনতম চাষীর মতন নতুন ক'রে গ্রহণ করবেন আত্মিক-জীবনের মহা-ঐশ্বর্য্যের স্বাদ। যে সহজ অন্তর-জীবনের রিক্ত-উপকরণ মহা-ঐশ্বর্য্যের কথা তিনি অন্তরে উপলব্ধি করেছেন—জীবনের প্রতি-দিনের, প্রতি মুহূর্ত্তের অভিজ্ঞতায় তাকে ক'রে তুলতে হবে সত্য।

তার জন্যে তিনি পরিত্যাগ করলেন, অভিজাতদের অভ্যাস আর বেশ-ভূষা, অঙ্গে ধারণ করলেন,. রাশিয়ার সাধারণ চাষীর মোটা পোষাক, নিজের হাতে সেই পোষাক তৈরী করবার জন্যে বাড়ীর একধারে বসালেন—তাঁত, আর নিজের হাতে মুচীর মতন তৈরী করলেন সাধারণ চাষীদের মতন মোটা চামড়ার জুতো। তারপর নিজের পরিবারবর্গের সকলের জন্যে সেই ব্যবস্থা করতে গিয়ে, কাউণ্টেসের কাছ থেকে পেলেন উন্মাদ বাধা রাগে, ক্ষোভে কাউণ্টেস্ ঘন-ঘন মূর্চ্ছা যেতে লাগলেন।

কাউণ্টেসের সমস্ত সরোষ প্রতিবাদ আর মূর্চ্ছাকে অগ্রাহ্য ক'রে টলস্টয় তাঁর সমস্ত জমি একে-একে চাষীদের মধ্যে দান ক'রে বিলিয়ে দিলেন। নিজে একটা সামান্য ছোট কাঠের ঘরে অতি সাধারণ লোকের মতন বাস করতে লাগলেন।

সমস্ত আসবাব-পত্র দূর ক'রে দিলেন, একটা সামান্য কাঠের খাট, নিজের হাতে তৈরী একটা কাঠের টেবিল, কাঠের চামচে, একটা মাটির কুঁজো, আর কাঠের একটা পাত—সেইটিই থালা।

—অতি সাধারণ লোকের মতন বাস করতে লাগলেন—

টলষ্টয় নিজের বই-এর স্বত্ব পর্য্যন্ত ত্যাগ করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, তাঁর বই-এ তাঁর বা তাঁর কোনো আত্মীয়ের কোনো স্বত্ব নেই। এবং যে-সব উপন্যাসের জন্যে আজকে তিনি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে গণ্য, সেগুলির লেখক-রূপে তিনি নিজেকে দিলেন ধিক্কার! যে-সাহিত্য প্রতিদিনের সাধারণ মানুষকে—যারা আজকের জগতের অধিকাংশ, তাদের অন্তরের উদ্দীপনা ও শক্তির খোরাক না জোগাতে পারে—টলষ্টয় ঘোষণা করলেন, সে-সাহিত্যের আজ কোনো প্রয়োজন নেই। জীবনের সহস্র বিলাস-উপকরণের মতন, সাহিত্যকেও আমরা ক'গার বাহারে

শুধু ওপর-থাকের মানুষদের মস্তিষ্ক-বিলাসের খেলা ক'রে তুলছি। টলস্টয় বৃদ্ধবয়সে লিখতে বসলেন এক নতুন সাহিত্য, মানব-মনের এক নতুন প্রকাশ, সাহিত্য-ধর্মের এক নতুন অভিব্যক্তি। ছোট-ছোট প্রবন্ধের আকারে, ছোট-ছোট পৌরাণিক কাহিনীর আকারে তিনি দুঃখ-বেদনা-সমস্যা-দগ্ধ পৃথিবীর সাধারণ মানুষদের জন্যে প্রাণ-বহ্নিতে দীপ্যমান এক অভিনব সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে চললেন। এইসময় তিনি শিশু আর বালকদের জন্যে যে কয়েকখানি বই লিখে রেখে গিয়েছেন, যাঁরা শিশু-সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই তা প'ড়ে দেখা উচিত। এইসব লেখা ছোট-ছোট বই-এর আকারে টলস্টয় এক পয়সা, দু'পয়সা ক'রে বিলোতে লাগলেন। এইসব বই প্রচারের জন্যে তিনি তাঁর শিষ্যদের দিয়ে—ঠেলাগাড়ী ক'রে লোকের দরজায়-দরজায় গিয়ে বিলি করবার ব্যবস্থা করলেন। চার বছরের মধ্যে এইভাবে টলস্টয় এক কোটি কুড়ি লক্ষ বই রাশিয়ার সাধারণ মানুষদের হাতে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

টলস্টয়ের এই সাহিত্যিক-সাধনা ও প্রচারের ফলেই পরবর্ত্তী যুগের রুশ-বিপ্লবীরা রাশিয়ার সাধারণ মানুষদের মধ্যে এমন একটা মানসিক প্রস্তুতির ভিত্তি পেয়েছিল যে, যার ওপর তাদের বৈপ্লবিক-সংগ্রামের ইমারত গ'ড়ে তোলা অনেক সহজ হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাসের চরম রসিকতা হলো, বিপ্লব-জয়ের প্রথম উত্তেজনার মূলে বোল্‌শেভিক-বিপ্লবীরা—টলস্টয়কেই 'রি-এ্যাক্‌সানারী ক্রীশ্চান' ব'লে 'নিষিদ্ধ' ক'রে গিয়েছিল; কিন্তু বিপ্লবের উত্তাপ কমে গেলে তারা দেখতে পেলে, টলস্টয় যেখানে গিয়ে ব'সে আছেন, সেখানে তাদের হাতুড়ি গিয়ে পৌঁছোবে না। বিপ্লবীদের এই মানসিক উত্তেজনাকে ঠাণ্ডা করতে, লেলিনকে—ম্যাক্‌সিম্ গর্কীর সাহায্য নিতে হয় এবং সেদিন বিপ্লবের ধ্বংসের সেই উন্মাদ তাণ্ডবের মধ্যে ম্যাক্‌সিম্ গর্কীকে যে বেদনাময় দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়, তার স্মৃতি আমার মনে একটি অপরূপ ছবিতে জেগে আছে···ম্যাক্‌সিম্ গর্কীর একটা ছবি···বিপ্লবীরা টলস্টয়ের লাইব্রেরী অংশত নষ্ট ক'রে গিয়েছে, সেই ধ্বংসের মধ্যে, পাথরের মত ম্লান

নির্বাক-মুখে গর্কী দাঁড়িয়ে আছেন। আজ অবশ্য সোভিয়েট রাশিয়া, বিপ্লবের সেই প্রথম উন্মাদনার ভ্রান্তিকে সংশোধন ক'রে, ইয়াস্‌নায়া পোলিয়ানাকে রাশিয়ার অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থরূপে সংরক্ষণ করছেন। কিন্তু টলষ্টয়ের শেষ-দিককার রচনাগুলিকে—যে-রচনা হলো টলষ্টয়ের জীবনের বৈশিষ্ট্য, সেগুলিকে তাঁরা ইতিহাসের মিউজিয়ামেরই বস্তু মনে করেন। কিন্তু সে অন্য কথা।

—বেরিয়ে পড়লেন...অনির্দ্দিষ্টের পথে—

টলষ্টয়ের এই ব্যবহারে কাউণ্টেসের ধৈর্য্যের বাঁধ একেবারে ভেঙে গেল। তাঁর স্বামীর বই লাখে-লাখে বিক্রি হচ্ছে, যার খুশি সে প্রকাশ করছে, অথচ তাতে তাঁর কিছু বলবার নেই। এবং তাঁর সবচেয়ে বড় রাগের কারণ হলো, তাঁর মেয়ে, মাকে ছেড়ে এই কাজে হলো বৃদ্ধ পিতার সবচেয়ে বড় সহায়। টলষ্টয়ের সমস্ত আত্মীয়ের মধ্যে একমাত্র এই কন্যা সেদিন আদর্শবাদী বৈরাগী বৃদ্ধ পিতার এই অন্তিম সংগ্রামে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এই কন্যাই পিতার মৃত্যুর পর, টলষ্টয়ের শেষ-জীবনের এই মর্ম্মান্তিক দ্বন্দ্বের কাহিনী Tragedy of Tolstoi পুস্তকে লেখেন।

কন্যার প্রতি কাউণ্টেস এতখানি রেগে গেলেন একদিন, যে, মার-মূর্ত্তি হয়ে মেয়েকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন, এবং রিভলবার নিয়ে দেয়ালে কন্যার ফটোকে গুলি দিয়ে ভেঙে চুরমার ক'রে দিয়ে, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

তখন টলষ্টয়ের বিরাশী বছর বয়স। অক্টোবর মাসের রাশিয়ার তুহিন-শুভ্র এক নিশীথ রাত্রি। ঘর আর বাইরের এই মর্মান্তিক দ্বন্দ্ব আর সহ্য করতে না পেরে সেই শীতার্ত্ত নির্জন রাতে একবস্ত্রে, শুধু কাঁধে একটা ঝোলা সম্বল ক'রে বৃদ্ধ-টলষ্টয় ঘরকে পেছনে ফেলে বেরিয়ে পড়লেন···অনির্দ্দিষ্টের পথে।

তার তিনদিন পরে তাঁকে দেখা গেল এক দূর পল্লী-ষ্টেশনের ছোট্ট টিনের ছাদের তলায়, পথের ধূলায় অবসন্ন মুমূর্ষু দেহে প'ড়ে আছেন···

গাঁয়ের দু'চারজন লোক সেই ষ্টেশনের ঘরে তাঁকে তুলে নিয়ে, চিন্তিত হয়ে পড়লো, বৃদ্ধ একবার চোখ তুলে বললেন, "ভাবনার কিছু নেই···তোমরা উদ্বিগ্ন হয়োনা ভাই···God will arrange everything···"

তার পাঁচদিন পরে সেইখানেই, পথের ধারের সেই ছোট্ট রেল-ষ্টেশনে, পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, রাশিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব···আধুনিক-বিশ্বের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন···কাউণ্ট লিও টলষ্টয়।

———

জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'
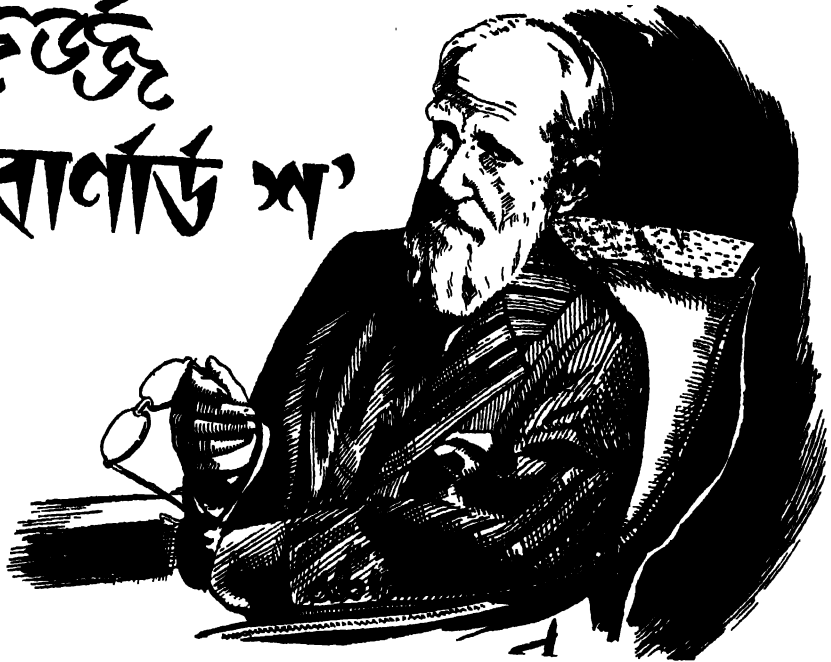
ইংরেজী ভাষা জগতের যেখানে গিয়ে পৌঁছিয়েছে, সেখানেই ইংরেজী বর্ণ-মালার তিনটি অক্ষর G. B. S. পাশাপাশি থাকলেই যে কোন্ ব্যক্তিটিকে বোঝায়, তা কাউকেই ব'লে দিতে হয়না।

নামের আদ্য-অক্ষর দিয়ে জগতে আর কোনো লোকই এমনভাবে পরিচিত নন। জর্জ্জ 'বার্ণার্ড-শ'কে হয়তো চেনেনা, কিন্তু 'জি, বি, এস্'-কে সব শিক্ষিত লোকই চেনেন!

গত একশো বছরের পৃথিবীতে মহাত্মা গান্ধী ছাড়া এমন বিচিত্র ব্যক্তিত্ব আর একটিও নেই।

দুই শতাব্দী ধ'রে এই একটি লোক সমানে জগৎকে চাব্‌কে এসেছেন, যত মার খেয়েছে, ততই জগৎ এই দুরন্ত দুর্ব্বাসাটিকে ভালোবেসেছে। গালাগালের বিনিময়ে এত ফুলের মালা জগতে আর কেউ পায়নি কখনো।

সাহিত্যিকদের হাতের কলম যে সত্যই তলোয়ার হতে পারে, যার চেয়ে ধারালো তলোয়ার আর হতে পারেনা, বার্ণার্ড-শ' তা অবিচ্ছেদ ভাবে সত্তর বছর ধ'রে দেখিয়ে গিয়েছেন।

তবু এই ভয়ঙ্কর দুর্ব্বাসাটিকে পৃথিবী এত ভালোবাসলো কেন ?

তার একমাত্র কারণ, তাঁর মধ্যে এতটুকু মেকী, এতটুকু ন্যাকামি আর ভণ্ডামি ব'লে কিছু ছিলনা, ইস্পাতের মতন স্বচ্ছ নীল তাঁর লৌহ-দৃঢ় চরিত্র। দুই শতাব্দী ধ'রে যেখানে দেখেছেন ভণ্ডামি আর ন্যাকামি, যেখানে দেখেছেন মেকীর দাপট, সেখানেই বজ্রধর ইন্দ্রের মতন বজ্রহাতে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি, ক্ষমাহীন নিষ্করুণ অমোঘতায় সোজা আঘাত করেছেন অন্যায়ের বুকে···সেখানে তাঁর কাছে জগতের অসীম ক্ষমতাশালী রাজা বা রাজশক্তি অথবা পথের সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অন্যায়কারী যত বেশী শক্তিধর, তাঁর আঘাত তত বেশী হয়েছে তীব্র আর তীক্ষ্ণ। কোনো প্রতিষ্ঠিত শক্তি—তা সে-শক্তি যত বড়ই হোক্না কেন · কোনো মহা-প্রবলের স্পর্দ্ধা, তা সে যত-বড়ই প্রবল হোক্না কেন, একমুহূর্ত্তের জন্যেও শ'কে সামান্যতম আপোষে নত করতে পারেনি। এই সর্ব্ব-অন্যায়-তুচ্ছকারী বীর্য্য, উদ্ধত প্রবলের বিরুদ্ধে এই পক্ষপাতহীন লোভহীন রুদ্রতা, সাধারণ মানুষের অসহায় অস্তিত্বের অন্তরে জাগিয়ে তোলে এক ·ম নির্ভরতা, এনে দেয় সুবিচারের সম্ভাবনার একটা মহা-আশ্বাস। শ'র সা[illegible] জগতের সাধারণ মানুষ পেয়েছে তার অস্তিত্বের পরম বল। তাই—হোক্ [illegible]ত্র, হোক্ কঠোর, যে-পুরুষের কাছে নারী পেয়েছে তার পরম নির্ভরতার নিঃসংশয় [illegible]তনি তাকেই সে চায় অন্তর থেকে। নারীর মতনই জনতা চায় সেই কঠোর বা[illegible]ং পুরুষকেই, নারীর মতনই যত তার কাছ থেকে আঘাত পায়, তত বেশী ক'রে তাকেই স্মৃতিতে আঁকড়ে ধরে! আঘাত হয় তখন ভালোবাসারই নিঃসংশয় প্রমাণ।

শ'—বর্ত্তমান বিশ্ব-সাহিত্যে সেই বলিষ্ঠ পুরুষ।

শ' একা ইংলণ্ডকে···ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাশক্তিধর ইংলণ্ডকে···যে ইংলণ্ডে সূর্য্য যেতো না অস্তাচলে, সেই ইংলণ্ডকে একা যতখানি আঘাত করেছেন, বোধহয় ইংলণ্ড সারা জগতের কাছ থেকে ততখানি আঘাত পায়নি। এবং সেইসঙ্গে স্বীকার করতে হবে ইংরেজের জাতীয়-মনের বলিষ্ঠতাকে, ইংলণ্ড কোনোদিন এই

ইংরেজ-লেখকের লেখনীর স্বাধীনতাকে এতটুকু ক্ষুণ্ণ করবার চেষ্টা করেনি অথবা তাকে খোসামোদ করবার জন্যে হাত কচলায়নি।

তার কারণ, শ' কোনোদিন কোনো ব্যক্তিগত বা দলগত বিদ্বেষে এই আঘাত করেননি, তাঁর আঘাতের মূলে ছিল, যাকে আঘাত করছেন তার প্রতি সুগভীর ভালোবাসা। মানুষকে অন্তর থেকে ভালোবাসতেন ব'লেই মানুষের অন্যায়ে তাকে তীব্রভাবে করেছেন আঘাত।

একবার একজন সমালোচক শ'কে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন তাঁর লেখনিতে এত আঘাতের জ্বালা!

শ' বলেছিলেন, 'আমি দেখলাম, আজকের যুগের মানুষেরা যেন একটা পুরনো গরুর গাড়ীতে চারদিকে ঝাঁপ বন্ধ ক'রে চলেছে···পথ চলতে মাঝখানে গাড়ী গভীর কাদা আর পাঁকে ডুবে গিয়েছে···গাড়ীর গরুরা পাঁকে ডুবে গিয়েছে···ঝাঁপের ভেতরে নেশাগ্রস্ত যাত্রীরা নেশায় ঝিমোচ্ছে···তারা বুঝতেই পা ছেনা, গাড়ী-সুদ্ধ তারা কিছুক্ষণ পরেই পাঁকে ডুবে মরে যাবে। বাইরে থেকে তা ব লাক তাদের ডাকছে সেই ডুবে-যাওয়া গাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে আসতে। কিন্তু জর্জ া কোনো অনুনয়-বিনয়ই সেই নেশাগ্রস্ত যাত্রীদের কানে গিয়ে পৌঁছচ্ছেনা। আমি দেখলাম, তাদের গাড়ী থেকে টেনে বার করবার একমাত্র উপায় ক া, তাদের অতি কুৎসিত ভাবে গালাগাল দেওয়া, যদি আমার গালাগাল শুনে আমার ওপর রাগে আমাকে মারতে সেই গাড়ী থেকে তারা বেরিয়ে আসে।'

এই সুন্দর উপমাটির মধ্যে শ'র সাহিত্যের স্বরূপের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে আছে। পাঁকে ডুবে-যাওয়া সেই পুরনো গাড়ীর নেশাগ্রস্ত যাত্রীদের বাঁচাবার জন্যেই সত্তর বছর ধ'রে শ' শব্দ-বজ্রের পর শব্দ-বজ্র র নিক্ষেপ ক'রে গেলেন। যার দেখবার দৃষ্টি আছে সে দেখতে পাবে, সেই বজ্রে র বিদ্যুতের আড়ালে হাসছে শিশুর মতন হাসি নিয়ে কুসুম-আয়ুধ এক কবি।

সুদীর্ঘ তিরানব্বুই বছর শ' বেঁচে ছিলেন। এবং পুরোমাত্রায় বেঁচেই ছিলেন।

যৌবনে মস্তিষ্কের যে জ্যোতির্শিখা অম্লান-বিভায় জ্বলে ওঠে, বার্দ্ধক্য ও জরাকে তুচ্ছ ক'রে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তা তেমনি আলোক-গৌরবে দীপ্যমান ছিল। মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও তিনি একটা নতুন নাটক লেখবার আয়োজন করছিলেন। চল্লিশ বছরে তলোয়ারের যে ধার ছিল, তিরানব্বই বছর বয়সে হাতের সেই তলোয়ারের তেমনি ধারই ছিল। তার ইস্পাৎ-নীল-স্বচ্ছতায় জরা এতটুকু কাল্‌চে দাগ ফেলতে পারেনি।

তাঁর দীর্ঘ জীবনে বারে-বারে বড়-বড় পুস্তকব্যবসায়ীরা এসে নানারকমে চেষ্টা করেছেন, তাঁকে দিয়ে তাঁর জীবন-কাহিনী লেখাতে। কিন্তু প্রত্যেকবারই শ' তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে তাঁদের প্রত্যাখ্যান করেছেন, বলেছেন, 'জীবন-চরিতের দিক থেকে আমার জীবন লোকের কাছে পছন্দসই হবেনা! কারণ তারা যে ধরনের জীবন-চরিত প'ড়ে আনন্দ পায়, আমার জীবনে তার কোনো উপাদানই নেই। আমি কাউকেই হত্যা করতে পারিনি, আমার জীবনে অস্বাভাবিক কিছুই ঘটেনি!'

শ'র নিজের ধারণা যাই হোক্‌না কেন, আমাদের কাছে তাঁর জীবন—মানব-ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল এক বিচিত্র অধ্যায়! এমন বিচিত্র জীবন খুব কম সাহিত্যিকেরই দেখতে পাওয়া যায়।

ইতিহাসের দিক থেকে শ'র জীবন মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে বিচিত্র, সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর, সবচেয়ে বৈপ্লবিক উত্থান-পতনের সাক্ষী। য়ুরোপকে তিনি মধ্যযুগের শেষ অন্ধকারে দেখেছেন, দেখেছেন তার মধ্যযুগীয় স্থির জীবনে অকস্মাৎ বিজ্ঞানের নব-অভ্যুদয়, বিজ্ঞানের নব-অভ্যুদয়ে দেখেছেন নতুন য়ুরোপকে জন্ম নিতে, আবার যাবার সময় দেখে গেলেন সেই বৈজ্ঞানিক-যন্ত্রকবলিত আধুনিক য়ুরোপের ভয়াবহ মৃত্যু-আক্ষেপ! আধুনিক পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতার জন্ম থেকে তার শৈশব, তার কৈশোর, তার যৌবন এবং তার অকাল-বার্দ্ধক্যকে দেখে গেলেন। তিনি যখন জগতে এসেছিলেন তখন ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের শিক্ষিত সভ্যরা ফ্যারাডের প্রাথমিক বৈদ্যুতিক-তত্ত্বের কথা শুনে ফ্যারাডেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কিন্তু এইজাতীয় অকেজো বৈদ্যুতিক-তত্ত্ব নিয়ে আমাদের কি লাভ হবে'?···

তারপর পৃথিবী ছেড়ে যাবার সময় শ' দেখে গেলেন সেই অতি-নিরীহ প্রাথমিক বৈদ্যুতিক-তত্ত্ব থেকে বিশ্ব-ত্রাস এটম্ বোমের চরম লাভকে। তিনি দেখেছিলেন, য়ুরোপের মেয়েদের অঙ্গের স্কার্ট সর্ব্বাঙ্গকে ঢেকে মাটিতে লুটিয়ে যেতে, তারপর দেখলেন সেই স্কার্ট একটু-একটু ক'রে পায়ের ওপর উঠতে···দেখলেন, য়ুরোপীয়-নারীর অঙ্গে সবস্ত্রতা আর নগ্নতার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা···দেখলেন, সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নগ্নতার বিজয়গর্ব্ব,—বিজয়-গর্ব্বের শেষে, নাটকের শেষ অঙ্কের পর এপিলোগের মতন আবার দেখে গেলেন সেই উদ্ধত নগ্নতার সলজ্জ আত্ম-আবরণ-চেষ্টা। এক-কথায় শ' হলেন আধুনিক মানুষের সমগ্র সামাজিক-বিবর্ত্তনের সাক্ষী। সেই-জন্যে সাহিত্যিকদের মধ্যে জীবনতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করবার নিঃসংশয় অধিকার তিনি অর্জ্জন করেছেন। এবং এই অধিকারের বলিষ্ঠ প্রয়োগ তিনি ক'রে গিয়েছেন। জগৎ এত বক্তৃতা কোনো সাহিত্যিকের কাছে শোনেনি।

সাহিত্যিক হিসাবে শ'র জীবন যেমন বিচিত্র, তেমনি স্বতন্ত্র। শ'র সাহিত্যিক-জীবন যেন একটা বিরাট মহাযুদ্ধ, যার মধ্যে অসংখ্য ছোট-ছোট যুদ্ধ।

চল্লিশ বছর পর্য্যন্ত তাঁকে একটার পর একটা যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই তাঁকে পরাজিত হতে হয়েছে। পরাজিত হয়েছেন বটে, কিন্তু পরাজয় স্বীকার করেননি। সম্পাদকের দপ্তর থেকে যে তরুণ সাহিত্য-প্রয়াসীকে ধন্যবাদের সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে আসতে হয়, তাঁর সান্ত্বনার জন্যে জানাচ্ছি, শ' অবিচ্ছেদ ভাবে প্রায় পনেরো বৎসর কাল ধ'রে সম্পাদক আর প্রকাশকদের দরজা থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন এবং একুশ বছর এক-নাগাড়ে এই ভাবে সাহিত্য-সংগ্রাম করার পর প্রথম তিনি উল্লেখযোগ্য অর্থের দর্শন পান। শেষে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী সাহিত্যিক রূপে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তীকালে যাঁর একটি রচনার মূল্য ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর বার্ষিক মাইনের সমান, তাঁর সাহিত্যিক-জীবনের প্রথম ন' বৎসরের সমগ্র আয় হলো মাত্র ৬ পাউণ্ড, এবং এই ৬ পাউণ্ডের মধ্যে তিনি ৫ পাউণ্ড পান এক পেটেণ্ট ওষুধের বিজ্ঞাপন

লিখে, আর ১ পাউণ্ড রোজগার করেন নির্ব্বাচন উপলক্ষে ভোট গণনার কাজ ক'রে। ইংলণ্ডের হেন প্রকাশক নেই, যিনি তাঁর প্রথম রচনাগুলি ফিরিয়ে দেননি। কিন্তু এই বিরাট প্রত্যাখ্যান শ'র সাহিত্যিক-অধ্যবসায়কে এতটুকু শিথিল করতে পারেনি। বারবার এইভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তিনি কলম না ছেড়ে দিয়ে, কলমকে আরো আঁকড়ে ধরলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন, ঝড় হোক্, বৃষ্টি হোক্, খেতে পান আর নাই খেতে পান, কেউ তাঁর লেখা নেয় বা না-নেয়, তিনি প্রতিদিন পুরো পাঁচ পাতা ক'রে লিখে যাবেন এবং ন' বছর ধ'রে প্রতিদিন সেই প্রতিজ্ঞা-মাফিক পাঁচ পাতা ক'রে লিখতেন। প্রতিজ্ঞাকে—যাকে বলে তিনি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করতেন—মানে, পাঁচ পাতা শেষ হয়ে যদি একটা লাইন অসম্পূর্ণ থেকে যেতো, তিনি সেই লাইন অসম্পূর্ণ রেখে দিতেন। সমস্ত হতাশার মধ্যে এই অসাধারণ অধ্যবসায়, এই অসামান্য সাহিত্যিক-বীরত্ব, জগতের প্রত্যেক দেশের সাহিত্য-প্রয়াসীর সামনে উজ্জ্বলতম আদর্শ হয়ে আছে।

তাঁর সমস্ত জীবনই ছিল এই অধ্যবসায় আর নিষ্ঠার সাধনা। পরাজয় কোনোদিন তাঁর মেরুদণ্ড স্পর্শ করতে পারেনি। যাঁর মুখের সামনে জগতের কোনো ধুরন্ধর রিপোর্টারই দাঁড়াতে পারতোনা, প্রথম জীবনে তিনি জনতার সামনে কথা বলতেই পারতেননা। একটা নিদারুণ ভীরুতা তাঁর কণ্ঠ চেপে ধরতো। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, এই দুর্ব্বলতাকে জয় করতে হবে। সেই পণ ক'রে তিনি প্রতিদিন লণ্ডনের রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আপনার মনে বক্তৃতা দিতে সুরু করলেন। লোকে পাগল মনে ক'রে চলে যেতো, কেউ উপহাস করতো। কিন্তু সেদিকে বক্তা ভ্রূক্ষেপই করতেননা। প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ্য রাস্তায় এসে তিনি বক্তৃতা দিতেন। ক্রমশ ভিড় জমতে লাগলো। পুলিশের লোকেরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে ভিড় সরিয়ে দেয়··শ' পুলিশদেরই সম্বোধন ক'রে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন···পুলিশরা মজা পেয়ে যায়। এমন বিচিত্র উন্মাদ তারা আর কখনো দেখেনি। এইভাবে আত্মপ্রণোদিত অধ্যবসায়ে শ' মানুষের সামনে কথা

বলার কুণ্ঠাকে চিরকালের মতন জয় করলেন। জনতার প্রশ্নে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে-দিতে তাঁর মধ্যে উত্তর দেবার এক বিস্ময়কব ক্ষমতা জেগে উঠলো। তাঁর উত্তর যেমন দ্রুত, তেমনি মর্মান্তিক। এবং এই উত্তরের বিচিত্রতার স্বাদ অনুভব করবার জন্যেই জগতের বড়-বড় রিপোর্টারবা তাঁর কাছে নানা রকমের অদ্ভুত সব প্রশ্ন নিয়ে হাজির হতেন। এইসব প্রশ্ন আর উত্তরের নানা বিচিত্র কাহিনী কিম্বদন্তী রূপে জগতের প্রত্যেক সভ্য-দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড়-বড় রিপোর্টাররা চেষ্টা করতো, কূট প্রশ্ন ক'রে শ'কে ঘায়েল করতে, কিন্তু এমন এক কথার ফাঁক দিয়ে শ' বেরিয়ে পড়তেন যে, তা কেউ আন্দাজও করতে পারতোনা, উল্টে প্রশ্নকর্ত্তাই ঘায়েল হয়ে যেতো। একদিন লণ্ডনের রাস্তার মোড়ে-মোড়ে অযাচিত ভাবে দাঁড়িয়ে যে ব্যক্তি চীৎকার ক'রে সারা হয়েছিলেন, পবে তাঁরই একটা মুখের কথা শোনবার জন্যে লোকে শত-সহস্র টাকা খবচ ক'বে দূর-দূরান্ত দেশ থেকে আসতো। তাঁকে একবার অন্তত আমেরিকায় নিয়ে যাবার জন্যে আমেরিকার নানান্ শ্রেণীর লোক নানা ভাবে বারবার চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হন্। মননশীলতার ক্ষেত্রে ফ্যাসানকে তিনি অন্তর থেকে ঘৃণা করতেন। তাই অধিকাংশ লোক যে-পথ ধ'রে চলতো, তিনি সযত্নে সেই পথ থেকে দূরে স'রে থাকতেন। গত শতাব্দী থেকে আমেরিকায় যাওয়া বড়লোকদের একটা ফ্যাসান হয়ে ওঠে। শ' সেইজন্যে কিছুতেই আমেরিকা যেতে চাইতেন না। অবশেষে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যে আসে। তিনি তাদেরও ফিরিয়ে দিলেন। ফিরে যাবার মুখে তারা জিজ্ঞাসা করলে, 'কিন্তু কেন যাবেন না, সেটা বলতে হবে আপনাকে।' শ' হেসে বললেন, 'তোমরা যে-রকম হুজুগে জাত, আমার ভয় হয়, আমি আমেরিকায় গিয়ে পড়লে, তোমরা হয়তো আমাকে আমেরিকাব প্রেসিডেণ্ট খাড়া করবে।'

শ' সুদীর্ঘ জীবন ধ'রে যে-দেবতার পূজা ক'রে গিয়েছেন, আমরা তাকে বলি—প্রজ্ঞা! জগৎকে, মানব-ইতিহাসকে, জীবনকে তিনি দেখে গিয়েছেন এই

প্রজ্ঞার আলোকে। এবং এই প্রজ্ঞার আলোকে যা সত্য ব'লে উপলব্ধি করেছেন, চরম আদর্শবাদীর মতন সারা জীবনে তাকেই আঁকড়ে ধ'রে ছিলেন। সেখানে কোনো লোভে, কোনো মোহে, কোনো ভয়ে—যা অসত্য ব'লে জেনেছেন তার সঙ্গে কোনো রকম আপোষ করেননি। ক্ষমাহীন দুর্ব্বাসার মতন সেখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাঁর অন্তরের অভিশাপ বর্ষণ ক'রে গিয়েছেন।

গত এক শতাব্দী ধ'রে পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতা তার বাহ্যিক আত্মস্ফীতির আড়ালে, বৈজ্ঞানিকতার আস্ফালনে আর রাজনৈতিক সর্ব্বজ্ঞতায় যে-সব গোঁজামিল, অর্দ্ধসত্য আর অনাচারের মেকী টাকাকে আসল ব'লে সগর্ব্বে চালাতে চেষ্টা ক'রে এসেছে, শ' মানব-ইতিহাসের প্রতিনিধিস্বরূপ সেই বুদ্ধিপ্রণোদিত বৈজ্ঞানিক-জোচ্চরীকে, সেই মেকীর ষড়-যন্ত্রকে, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত গর্দ্দভের হাস্যকর বীরত্বের অভিনয়কে, লোক-চক্ষুর সামনে স্বরূপে উদ্‌ঘাটিত ক'রে দিয়েছেন। পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতার আত্ম-প্রবঞ্চনার মূঢ়তাকে, বৈজ্ঞানিকতার ছদ্মবেশে-আবৃত আধুনিক জগতের অভিনব কুসংস্কারকে, স্বর্ণপ্রাণ সভ্যতার ভদ্রবেশী বর্ব্বরতাকে দিয়ে গিয়েছেন ক্ষমাহীন মর্ম্মান্তিক আঘাত।

আদর্শের ক্ষেত্রে তিনি মহাত্মা গান্ধীর মতনই আদর্শবাদী ছিলেন এবং বুদ্ধি দিয়ে, চেতনা দিয়ে যাকে সত্য ব'লে বুঝতেন, সর্ব্ব মন-প্রাণ দিয়ে আক্ষরিক ভাবে তাকে অনুসরণ ক'রে চলতেন। যা সত্য ব'লে জানতেন, নিজের জীবনেও তাকে সত্যভাবে পালন করতেন। মহাত্মা গান্ধীর মতনই তাঁর কাছে সত্য ছিল জীবনের নিত্য-আচরণীয় কর্ম্ম।

তত্ত্বের দিক থেকে আমিষ-ভোজনকে তিনি মানুষের আদিম বর্ব্বরতার অনুসরণ ব'লে মনে করতেন, বিচার-বুদ্ধিহীন মানুষ যখন অরণ্য-পশুর সঙ্গে থেকে-থেকে অরণ্য-পশুর অভ্যাসই পালন ক'রে চলতো···তারপর মস্তিষ্কজীবী মানুষ বীজ থেকে শস্য উৎপাদনের বিস্ময়কে আবিষ্কার ক'রে, কৃষির প্রবর্ত্তনে সে অরণ্য থেকে স'রে আসে, বিশ্ব-প্রকৃতিকে সচেতন ভাবে দেখতে শেখে, বিশ্ব-ব্যবস্থার মধ্যে মানব হিসাবে তার কেন্দ্রীয়স্থানের সন্ধান পায়, যেখানে সে জীবনের নির্ব্বিচার খাদক

নয়, জীবনের পরিপোষক। তাই শ' মনে করতেন, বিশ্বভরা নানা বিচিত্র ও সুবিপুল খাদ্যের মধ্যে যে সভ্য মানুষ আমিষ ভক্ষণ করে, সে তার আদিম রাক্ষস-চরিত্রকেই বহন ক'রে চলেছে···আমিষভোজী আধুনিক মানুষকে তাই তিনি বলেছেন Cannibal, নর-খাদক, যারা আত্মীয়ের মাংস পরমানন্দে উদরসাৎ করতো। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত শ' অবিশ্রান্ত আন্দোলন ক'রে গিয়েছেন মানুষের এই আমিষ-ভক্ষণ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে। সমস্ত প্রাণীজগতের মধ্যে এক প্রাণ-বস্তুর যে রক্ত-সম্পর্ক, তত্ত্বের দিক দিয়ে শ' যেমন সেই মহা-সত্যকে উপলব্ধি করতেন, বাস্তব-জীবনেও তিনি সেই সত্যকে ভুলতে পারতেননা, তাই মাছ বা মাংস খাওয়াকে তিনি আত্মীয়ের মাংস খাওয়াই মনে করতেন। অনেকেই হয়তো জানেননা, শ' মূক-ইতর প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের প্রাণ-সম্পর্ককে কতখানি বাস্তব-মূল্য দিতেন। ইতর-প্রাণীদের অস্ফুট বাণীহীন ধ্বনির মধ্যে একটা ভাষা আবিষ্কারের জন্যে তিনি জীবনের বহু মুহূর্ত্ত কঠোর পরিশ্রমে নিয়োজিত করেছেন।

শীতপ্রধান পাশ্চাত্যদেশে জন্মগ্রহণ করেও তিনি জীবনে মদ্যস্পর্শ করেননি। স্বাস্থ্যের জন্যে, উত্তেজনার জন্যে, প্রেরণার জন্যে যারা মদ্য গ্রহণ করেন, শ' বলতেন তারা মানুষের মনকে ও মস্তিষ্ককে সবচেয়ে বেশী অপমান করে। মনের আর মস্তিষ্কের অধিকারী হয়ে মানুষ যে সুরার কাছে অনুপ্রেরণা আশা করে, মানুষের পক্ষে তার চেয়ে হীনতার কারণ আর কিছু নেই। এই সুরা-পানের সঙ্গে তাঁর জীবনের তিক্ততম বেদনার স্মৃতি জড়িয়ে ছিল। তাঁর বাবা সুরার দাস হয়ে গিয়েছিলেন এবং তার জন্যে প্রথম জীবনে তাঁদের বহু দারিদ্র্য ও বহু সামাজিক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। পিতার সেই লাঞ্ছনার কথা পুত্র জীবনে ভোলেননি।

শ' বর্ত্তমান ছাত্রশিক্ষা-পদ্ধতি আর স্কুলের পাঠ্যব্যবস্থার ঘোরতর বিদ্রোহী ছিলেন। ইংলণ্ডের মতন জায়গায় স্কুল আর ছাত্রজীবন দেখে তিনি তার প্রাণহীনতায় আর অন্তঃসারশূন্যতায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, তিনি যদি ঋষিদের দেশ ভারতবর্ষের আধুনিক স্কুল-ব্যবস্থা আর ছাত্র-জীবনের পরিচয় পেতেন, তাহ'লে ইংলণ্ডের স্কুল উড়িয়ে

দেবার জন্যে যেমন পার্লামেণ্টের কাছে 'ডিনামাইট' চেয়েছিলেন, এখানকার জন্যে হয়ত 'এটম্ বোম' চেয়ে বসতেন। একবার তিনি ইংলণ্ডের প্রচলিত স্কুল-জীবনের সমালোচনা করেন। বহুবার, বহুভাবেই তিনি তা করেছেন, এবং সেই সমালোচনায় তিনি স্কুলের সঙ্গে কারাগারের তুলনা ক'রে বলেন, স্কুলের চেয়ে কারাগার ঢের নিরাপদ জায়গা। কারাগারে যারা প্রহরী থাকে, তারা স্কুলের প্রহরীর মতন, নিজেদের লেখা বই পড়তে বাধ্য করায়না, জোর ক'রে তোমাকে ধ'রে রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে-সব বিষয় তারা জানেনা, সেইসব বিষয়ের বক্তৃতা শোনায়না। কারাগারে হয়তো তোমার দেহকে তারা শাস্তি দেয়, আঘাত করে, কিন্তু স্কুলে তারা তোমার মস্তিষ্ককে আঘাত করে, তোমার অন্তরাত্মাকে দেয় শাস্তি।

শ' নিজে স্কুলের প্রথম ধাপ থেকেই স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেন এবং যখন মাত্র পনেরো বছর তাঁর বয়স, সেইসময় সংসারের অভাবের চাপে তাঁকে জীবিকা সংস্থানের পথে বেরুতে হয়। এবং দীর্ঘদিন ধ'রে সেই পথে তাঁকে পদে-পদে বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। বোধহয় সেরকম বাধার সঙ্গে খুব কম সাহিত্যিককেই সংগ্রাম করতে হয়েছে। তাঁর জীবন হলো—মানুষের অধ্যবসায়ের, মানুষের চেষ্টার, মানুষের নিরলস কর্ম্মবুদ্ধির বিজয়-গৌরব। জীবনের যা-কিছু ছিল বাধা, তাকেই তিনি সজাগ চেষ্টায় পরিণত করেন বিজয়-শক্তিতে।

লণ্ডনের পথে-পথে অনাহারে এক প্রকাশকের দরজা থেকে আর-এক প্রকাশকের দরজায় যেদিন ঘুরে বেড়িয়েছেন, সেদিন কে কল্পনা করতে পারতো, এই ব্যক্তিই একদিন পাবে সাহিত্যের জন্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান, 'নোবেল-প্রাইজ'? যেদিন শ' নোবেল-প্রাইজ পেলেন, সেদিন তাঁর আর অর্থের প্রয়োজন ছিলনা, তাই নোবেল-প্রাইজের সঙ্গে-সঙ্গে যে সাত হাজার পাউণ্ড লেখকের প্রাপ্তব্য, তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন, ঐ টাকাটা বাদ দিয়ে যদি তাঁকে নোবেল-প্রাইজ দেওয়া হয়, তাহ'লে তিনি নোবেল-প্রাইজ নিতে রাজী আছেন, নতুবা তিনি চাননা নোবেল-প্রাইজ! এমন বিচিত্র প্রত্যাখ্যান সুইডেনের নোবেল-প্রাইজ-

কমিটি আর শোনেনি। তাঁরা শ'কে অনেক ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলেন, দানের সর্ত্ত হিসাবে এই টাকাটা সম্মানিত লেখকদের হাতে দিতে তাঁরা আইনত বাধ্য। অবশেষে ঠিক হলো, আইনের মর্য্যাদা বাঁচাবার জন্যে শ' এক সেকেণ্ডের জন্যে সেই সাত হাজার পাউণ্ডের চেকখানিকে একবার হাতে নিয়ে ধরবেন, তারপর সেই চেক তিনি এ্যাংলো-সুইডিশ সাহিত্য-একাডেমীকে দান ক'রে দেবেন। কার্য্যত তাই-ই হলো।

গান্ধীজীর মতনই শ'র দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, জরাকে তুচ্ছ ক'রে তিনি শতায়ু কিম্বা আরো অধিক আয়ু ভোগ করেন। প্রজ্ঞাদীপ্ত আয়ু মানুষের সর্ব্বোত্তম ঐশ্বর্য্য, সে-ঐশ্বর্য্যের মায়া কোনো দার্শনিক কোনো কারণেই পরিত্যাগ করতে চাননি। যতদিন মানুষের আছে অভাব, আছে দৈন্য, আছে ত্রুটি, ততদিন প্রয়োজন আছে আয়ুর অসমাপ্ত সংগ্রামকে শেষ করবার জন্যে। মহাত্মা গান্ধীর মনে শেষকালে আসে মৃত্যু-ইচ্ছা। কিন্তু শ'র মনে কোনো কারণেই জাগেনি মৃত্যু-ইচ্ছা। রবীন্দ্রনাথের মতন তিনি স্পষ্ট অকুণ্ঠ-ভাষায় বলেছিলেন, 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে'। এই কর্ম্মময় বিচিত্র ধরণীতে বেঁচে থাকার একটা পরমোল্লাস আছে, শ' সেই কথাটাই ব'লে গিয়েছেন, তাঁর জীবন সম্বন্ধে শেষ কথা—"জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত আমি সজ্ঞানে উপভোগ করেছি। আমি সেক্‌স্‌পীয়ারের মতন কোনোদিন বলবোনা, জীবন হলো ক্ষণস্থায়ী দীপশিখা,—আমি জীবনকে পেয়েছি জ্বলন্ত মশালের মতন, দু'হাত দিয়ে সেই বিরাট মশালকে চেপে ধ'রে আছি···এই পৃথিবী থেকে যেদিন চলে যাবো, সেদিন আমার পরবর্ত্তীকালের লোকদের হাতে সেই জ্বলন্ত মশালকে সেইরকম অনির্ব্বাণ জ্যোতির্ম্ময় শিখাতেই দিয়ে যাবো!"

সেই অনির্ব্বাণ মশাল শ' রেখে গিয়েছেন তাঁর বিরাট সাহিত্যে···প্রজ্ঞার জ্যোতির্শিখা।

আধুনিক জগতে যাঁরা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের ব্যক্তিত্বে একটা স্থায়ী প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন ক'রে গিয়েছেন, 'ধ্রুবতারা'য় তাঁদের জীবনের মূল কথাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছি। সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে তাঁদের জীবনের বৈশিষ্ট্যটুকুকেই পরিস্ফুট করা হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে আরম্ভ ক'রে শিল্প-কলা পর্য্যন্ত আধুনিক-জীবনের প্রত্যেক স্তরেই যাঁরা খ্যাতি ও কীর্ত্তি অর্জ্জন করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের জীবনের মূলেই আছে নিদারুণ অধ্যবসায় আর নিশ্ছিদ্র কর্মনিষ্ঠার সঙ্গে সেই রহস্যময় প্রাণ-দেবতার আশীর্ব্বাদ—যাকে কোনো নিয়ম, কোনো যুক্তি, কোনো পরিমাপে ধরা যায়না। একমাত্র নিরলস সাধনাই পারে সেই আশীর্ব্বাদকে আকর্ষণ ক'রে আনতে।

এনড্রু কার্নেগী যখন জীবন আরম্ভ করেন, তখন এক ঘণ্টায় মাত্র এক পয়সা রোজগার করতেন, যখন জীবন পরিত্যাগ ক'রে গেলেন, তখন তাঁর টাকা নিয়ে জগতে পঞ্চাশ-ষাট জন লোক ক্রোরপতি হয়ে গেল!

তাঁর নাম নিয়ে আজ আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গর্ব্ব করে, কিন্তু আমেরিকা তাঁর সৎ-মা, তাঁর নিজের জননী-জন্মভূমি হলো—স্কটল্যাণ্ড। স্কটল্যাণ্ডের ডানফার-লাইন নামে ছোট্ট একটা গ্রামে দু-খানা ভাঙা ছোট-ছোট কুঁড়ে ঘর, সেইখানে জন্মগ্রহণ করেন বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী। একটা ঘরে কার্নেগীর বাবার একটা ছোট তাঁত ছিল। আর-একটা ঘরে তাঁরা থাকতেন...রাঁধতেন খেতেন, শুতেন।

কিন্তু সেই একটা তাঁতে ক্রমশ সংসার অচল হয়ে এলো! সেইসময় হাওয়ায়-হাওয়ায় য়ুরোপের নগরে, গ্রামে একটা কথা রাষ্ট্র হয়ে পড়লো, আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের পথে নাকি সোনা প'ড়ে থাকে...কুড়িয়ে নিলেই হলো। যে-কেউ কোনো রকমে সেখানে একবার গিয়ে পড়েছে, প্রচুর টাকা রোজগার ক'রে মনের আনন্দে সেইখানেই থেকে গিয়েছে...স্বর্ণপুরী, অতএব স্বর্গপুরী।

কার্নেগীর বাবাকেও টানলো সেই স্বর্ণপুরী। স্কটল্যাণ্ডের বাস তুলে দিয়ে, স্ত্রী পুত্রের হাত ধ'রে বেরিয়ে পড়লেন তিনি ভাগ্যের অন্বেষণে; আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দিকে।

কিন্তু স্বর্ণপুরীতে এসে দেখলেন, সে স্বর্গপুরী নয়। তবে কাজ করতে চাইলে, কাজের অভাব নেই। দিন চালাবার মতন হাজার-হাজার ছোট রকমের কাজ... সবাই কাজ করছে।

কার্নেগীর বাবার ছিল—শিল্পী-মন। তাঁতের কাজ তিনি ভালোই জানতেন। তাই নিজের ছোট-খাট একটা তাঁত আবার তৈরী করলেন এবং তা থেকে টেবিল ঢাকা দেওয়ার রকমারি ছোট-ছোট আচ্ছাদনী কাপড় তৈরী করতে লাগলেন। তারপর নিজেই কাঁধে ক'রে দরজায়-দরজায় ফিরি ক'রে বিক্রি করতে লাগলেন সেগুলো।

কার্নেগীর মা-ও স্বামীকে সাহায্য করবার জন্যে হাতের কাছে যা কাজ

পেলেন, তাই নিলেন। দিনেরবেলায় এক মুচীর দোকানে জুতো সেলাই করতেন, বিকেলবেলা এক ধোপার কাছে কাপড় কাচতেন। এইভাবে স্বামী-স্ত্রীতে যা রোজগার করতেন, তাতে কায়ক্লেশে কোনো রকমে দিন চলে যেতো।

কার্নেগী তখন ছোট ছেলে। কিন্তু সেই বয়সেই শিশু বুঝতে পারতো, তার মা-বাপকে কি নিদারুণ পরিশ্রম করতে হয়। বিশেষ ক'রে বালক মাতৃঅন্ত প্রাণ ছিল। মন প্রাণ দিয়ে মাকে ভালবাসতো সে। তার জগতে তার মা-ই ছিল সব। সেই মা প্রতিদিন আঠারো ঘণ্টা ক'রে খাটেন তাদের অন্ন জোটাবার জন্যে, এ-কথাটা সেই বালককালেই কার্নেগীর মনে গেঁথে গিয়েছিল। তাই মা'র দিকে চেয়ে-চেয়ে বালক ভাবতো, তার মা স্বর্গের দেবী···স্বর্গের দেবীর মতনই মাকে শ্রদ্ধা করতো।

সারাদিনের পরিশ্রমের পর মা যখন ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরতেন, বালক মা'র বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তো। মা'র বুকে মুখ রেখে বলতো, 'মা, আমি যখন বড় হবো, তুমি দেখবে, আমি নিশ্চয়ই বড়লোক হবো, তোমাকে আর তখন পায়ে-হেঁটে ঘুরে বেড়াতে হবেনা · আগে তোমার জন্যে একটা গাড়ী কিনবো···তোমার জন্যে অনেক চাকর-বাকর রাখবো···তারাই সব কাজ করবে···তোমাকে আর খাটতে হবেনা।'

আদরে মা ছেলের শিরশ্চুম্বন করতেন; বলতেন, 'ভগবান করুন, তোর কথা যেন সত্যি হয়।'

কার্নেগী মাকে এতখানি ভালোবাসতেন যে, কার্নেগীর যখন বাইশ বছর বয়স, তখন কার্নেগী মা'র কাছে শপথ গ্রহণ করেন; বলেন, 'মা, আমাকে বিয়ের কথা বোলোনা। তুমি যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন তোমার আর আমার মাঝখানে আর কোনো স্ত্রীলোকই থাকবেনা। যতদিন তুমি আছো, তুমিই আমার সব।'

কার্নেগী অক্ষরে-অক্ষরে এই শপথ রেখেছিলেন। যতদিন তাঁর মা জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি বিয়ের কথা পর্য্যন্ত ভাবেননি। এবং তাঁর মা বেঁচেছিলেন,

এই শপথ করার পর ত্রিশ বছর পর্য্যন্ত। তিনি যখন মারা গেলেন, তখন কার্নেগীর বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গিয়েছে। এবং বাহান্ন বছর বয়সে কার্নেগী প্রথম বিবাহ করেন। বর্ত্তমান যুগে মাতৃভক্তির এমন উদাহরণ পাশ্চাত্ত্য-জগতে আর দেখেছি ব'লে মনে হয়না।

—বালক মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তো—

ছেলেবেলায় কার্নেগীর পোষাকের মধ্যে ছিল দুটো হাফ্‌প্যাণ্ট আর মাত্র একটা সার্ট। রোজ রাত্রিবেলা কার্নেগীর মা ছেলের গা থেকে সেই সার্টটি খুলে নিয়ে কেচে দিতেন। সকালবেলা আবার কার্নেগী সেই সার্টটি পরতেন।

মা'র এই ভালোবাসা কার্নেগীর জীবনের মূলে ছিল সর্ব্বোত্তম প্রেরণা। তাঁর সমস্ত কর্ম্মশক্তি, তাঁর সমস্ত সাধনার মূলে ছিল এই মাতৃ-প্রেম। মাকে সুখী করতে হবে, এই ছিল কার্নেগীর জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দুরাকাঙ্ক্ষা। তাঁর সমস্ত চৈতন্য, সমস্ত হৃদয়কে আচ্ছন্ন ক'রে ছিল তাঁর জননীর সেই অগাধ ভালোবাসা। আজকের বৈজ্ঞানিক-যুগে, যান্ত্রিক হৃদয়হীনতার পরিবেশে—যেখানে মানুষের অন্তরের আদিম-সম্পর্কের মধুময় শিকড়গুলি শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, সেখানে পাশ্চাত্ত্য-জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ীর জীবনের এই মাতৃ-গৌরব-কাহিনী, দগ্ধ মরুভূমির মধ্যে শ্যামল মরূদ্যানের মত বিরাজ করছে। যেদিন কার্নেগীর মা দেহরক্ষা করলেন, সেদিন তিনি এত অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে, তার পনেরো বছর পরে পর্য্যন্ত তিনি মা'র নাম না কেঁদে উচ্চারণ করতে পারতেননা।

এইজাতীয় হৃদয়-বৃত্তির পরিচয় আমাদের অনেকের ধারণা—পূর্ব্ব-জগতেরই বুঝি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সে ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। হৃদয়ের ক্ষেত্রে নেই পূর্ব্ব আর পশ্চিম।

বৃদ্ধ বয়সে কার্নেগী একবার স্কটল্যাণ্ডে নিজের জন্মভূমি দেখতে যান। সেখানে গিয়ে এক বৃদ্ধা নারীর সঙ্গে হঠাৎ তাঁর পরিচয় ঘটে। তিনি নিজে যেচে সেই বৃদ্ধার সঙ্গে পরিচয় করেন। কারণ, বৃদ্ধার মুখের চেহারার সঙ্গে তাঁর মা'র মুখের মিল ছিল। কার্নেগী সংবাদ নিয়ে জানলেন, বৃদ্ধা অসহায়—ঋণদায়গ্রস্ত। স্কচ্-মহিলা বললেন, তাঁর সমস্ত জমি-জমা মহাজনের কাছে বাঁধা। কার্নেগী বৃদ্ধার ঋণের শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত শোধ ক'রে দিলেন তৎক্ষণাৎ।

কার্নেগীর বিপুল ঐশ্বর্য্য আসে ইস্পাতের ব্যবসা থেকে, তাই ব্যবসায়-জগতে তাঁর নাম হয়—'ষ্টিল-কিং'। তিনি যে অন্য-সব ব্যবসায়ীদের চেয়ে লোহা আর ইস্পাত সম্বন্ধে বেশী অভিজ্ঞ ছিলেন তা নয়, তাঁর উন্নতির মূলে ছিল, মানুষ সম্বন্ধে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান। কি ক'রে মানুষের কাছ থেকে কাজ আদায় করতে হয়, কি ক'রে মানুষকে চালাতে হয়, সে সম্বন্ধে ছিল তাঁর অসামান্য প্রতিভা। সেই প্রতিভাই হলো তাঁর আসল মূলধন।

ছেলেবেলা থেকেই তাঁর এই বিশেষ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। বালক-কালে যখন তিনি স্কটল্যাণ্ডে ছিলেন, তখন একবার বন থেকে একজোড়া খরগোস ধরেছিলেন। সেই দুটি খরগোস থেকে কালক্রমে একরাশ ছেলেপুলে হয়ে গেল। তখন বালক মহাবিপদে পড়লো। কোনো রকমে দুটি খরগোসের

—স্কচ-মহিলা বললেন…সমস্ত জমি জমা মহাজনের কাছে বাঁধা।

খাদ্য সে নিজের চেস্টায় বন-বাদাড় থেকে জোগাড় ক'রে আনতো, কিন্তু এতগুলি খরগোসকে কি ক'রে সে নিত্য নিয়মিত খাদ্য জোগাবে? বালক মহা-দুর্ভাবনায় প'ড়ে গেল। হঠাৎ বালকের মাথায় এক বুদ্ধি এসে গেল। খেলার মাঠে সমবয়সী

বন্ধুদের ডেকে সে তার খরগোসের বংশ-বৃদ্ধির সংবাদ জানালো এবং সেইসঙ্গে বন্ধুদের কাছে এক প্রস্তাব উপস্থিত করলো, বন থেকে খাবার জোগাড় ক'রে যে আনতে পারবে, তার নামে খরগোস-শিশুদের নামকরণ করা হবে! খরগোস-শিশুদের নামকরণ ব্যাপারে এই নতুন প্রথায় বন্ধুদের প্রত্যেকের উৎসাহ জেগে উঠলো, প্রত্যেকেই নিলো একটি-একটি শিশুর খাবারের ভার। বালক কার্নেগীর সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

সেদিন বালক-কালে খেলাঘরে তাঁর যে বুদ্ধির পরিচয় আমরা পাই, পরিণত বয়সে ব্যবসার ক্ষেত্রে সেই একই বুদ্ধির স্ফুরণ দেখতে পাওয়া যায় বড়-বড় ব্যবসাগত সমস্যার সমাধানে। একবার পেন্‌সিলভানিয়া রেল-কোম্পানী বিপুল টাকার রেল-লাইন কিনবে ব'লে ঘোষণা করলো। অনেক ইস্পাত-ওয়ালা চেষ্টা করতে লাগলো, এই বিরাট অর্ডারটি পাবার জন্যে। কার্নেগীও তাদের মধ্যে একজন ছিলেন। হঠাৎ তাঁর মাথায় এক বুদ্ধি এলো···সেই খরগোস-ছানার খাদ্য সংগ্রহের বুদ্ধিই···পেন্‌সিলভানিয়া রেল-কোম্পানীর ম্যানেজার তখন মিঃ জে, এডগার টমসন। পেন্‌সিলভানিয়ার পিটস্‌বার্গ শহরে কার্নেগী বিরাট এক নতুন ইস্পাত-কারখানা তৈরী করালেন এবং সেই নতুন কারখানার নাম দিলেন, পেন্‌সিলভানিয়া রেল-কোম্পানীর কর্ত্তার নামে—'জে, এডগার টমসন ষ্টিল ওয়াকস্'। স্বভাবতই টমসন সেই প্রীতির নিদর্শনে এতখানি মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে, তাঁর কাছ থেকে পেন্‌সিলভানিয়া রেল-লাইনের অর্ডারটি পেতে কার্নেগীর আর কোনো বেগ পেতে হলোনা। কার্নেগী জানতেন, ব্যবসার ক্ষেত্রে কি-রকম সার্থক ভাবে মনস্তত্ত্বকে প্রয়োগ করা যায়। তাঁর সুবিপুল উন্নতির মূলে ছিল সেই অসাধারণ মনস্তত্ত্ব-জ্ঞানের সুকৌশল প্রয়োগ। আমেরিকার বিরাট ব্যবসার ইতিহাসের মূলে রয়েছে এই মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের প্রয়োগ-কৌশল!

সম্পূর্ণ রিক্ত অবস্থা থেকে যশ ও ঐশ্বর্য্যের সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠেছেন, এমন শত-শত লোকের জীবনী প'ড়ে দেখলাম···খুঁজলাম কি কৌশলে তাঁরা এই

অসাধ্য সাধন ক'রে যেতে পেরেছেন। তাঁদের এই অলৌকিক কৃতিত্বের পেছনে কোনো কি নিয়ম নেই? কোনো ফরমূলা? এইসব কৃতী-জীবনের সূত্র কি? সেটা কি দৈবের দান? জন্মগত প্রতিভার ফল? না, কঠোর পরিশ্রমের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম? বহুদিন ধ'রে বহু জীবনী অনুসন্ধান ক'রে ফিরেছি এই প্রশ্নের উত্তরের জন্যে। বহু কৃতি-পুরুষের জীবনের উত্থান-পতনের তরঙ্গের সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছি সজাগ দৃষ্টি নিয়ে। তার ফলে যে সূত্রটি আবিষ্কার করেছি, দেখলাম, বহু-বহু গত বর্ষ আগে, আমারই মতন বহু মানুষ সেই একই সূত্রকে আবিষ্কার ক'রে গিয়েছেন। বহু বিচিত্র পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়েও অপরিবর্ত্তনীয় রয়ে গিয়েছে সেই সূত্র। সেই সূত্র, সেই জীবন-সত্য হলো—যে উদ্যোগী, ভাগ্যলক্ষ্মী তারই গলায় পরিয়ে দেন মালা। দৈবের দান আছে, প্রতিভার বিশেষ অবদানও আছে, কিন্তু উদ্যোগী না হ'লে তাদের স্পর্শ পাওয়া যায়না। কেউ বলতে পারেনা, কেন একজন নিঃস্ব যুবক 'স্যার রাজেন' হয়, আর কেনই-বা অসংখ্য লোক পরিশ্রম ক'রে উদরান্নের সংস্থান করতে পারেনা! প্রত্যেক কৃতী-লোকের জীবন থেকে দেখা যায়, তাঁদের জীবনে এমন একটা মুহূর্ত্ত আসে, এমন একটা লগ্ন আসে, এমন একটা সুযোগ আসে, যার তরঙ্গ-শীর্ষে অকস্মাৎ কালকের অবজ্ঞাত হয়ে ওঠে—আজকের বিশ্ব-বিদিত। কিভাবে কখন সেই দিব্য মুহূর্ত্তটি আসে তা কেউই বলতে পারেনা, তাই মানুষ তাকে জন্মান্তরের পুণ্যফল, কিম্বা দেবতার আশীর্ব্বাদ ব'লে দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য মনে করে, কিন্তু কৃতী-পুরুষদের জীবনী অনুসন্ধান ক'রে দেখেছি, নিশ্ছিদ্র নিষ্ঠা আর নিরলস পরিশ্রমে সেই মুহূর্ত্তকে আকর্ষণ ক'রে আনা যায়। অবশ্য, জীবনের কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিনা পরিশ্রমে, বা বিনা চেষ্টায় কারুর-কারুর জীবনে সেই অপরূপ লগ্ন এসেছে, যাঁদের আমরা সাধারণত বলি প্রতিভাবান্, তাঁদের জীবনে এইজাতীয় লগ্ন অকস্মাৎ দেখা দেয়, কিন্তু পরিশ্রম আর কর্ম্মনিষ্ঠা না থাকার দরুণ সেই অপরূপ মুহূর্ত্তকে পেয়েও তাঁরা ধ'রে রাখতে পারেননা, তুবড়ীর অগ্ন্যুদ্গারের মতন একটি নিমেষকে

আলোকিত ক'রে তা নির্ব্বাপিত হয়ে যায়। কত প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটেছে পরিশ্রম আর কর্ম্মনিষ্ঠার অভাবে তার ইয়ত্তা নেই।

কার্নেগীর বিস্ময়কর অভ্যুদয়ের পেছনে রয়েছে পরিশ্রম আর কর্ম্মনিষ্ঠার সঙ্গে সেই রহস্যময় শক্তির আশীর্ব্বাদের সমন্বয়।

যে পিটস্‌বার্গ শহরে পরবর্ত্তীকালে তিনি হন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী, সেই পিটস্‌বার্গ শহরে তিনি প্রথম প্রবেশ করেন কিশোর-কালে. সেখানকার টেলিগ্রাফ অফিসের সামান্য একজন বেয়ারা, বা পিয়ন হয়ে। তাঁর কাজ ছিল, লোকেব দরজায় টেলিগ্রাফ পৌঁছে দেওয়া, বেতন দিনে ছু'শিলিং মাত্র। আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের জীবনমানে ছু'শিলিং—আমাদের দেশে ছু'আনার সামিল। তাতেই বালকের খুশী ধরেনা। ভয় হয়, বুঝি এমন চাকরিটা চলে যায়। কারণ, পিটস্‌বার্গ শহর কিশোরের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তার পথ-ঘাট কিছুই সে জানেনা। অথচ পথে-পথে তার কাজ। তাই রোজ সন্ধ্যেবেলা অফিস-পাড়া আর ব্যবসা-পাড়ার প্রত্যেক বাড়ীর ঠিকানা আর রাস্তার নাম মুখস্থ করে। দিনেরবেলা দেখে, অফিসে টুলে ব'সে টেলিগ্রাফ অপারেটর 'টরা-টক্কা' করছে। কিশোরের সাধ যায়, কবে সে অপারেটার হবে। রাত্রিবেলা একটা বই কিনে টেলিগ্রাফী শেখে, আর ভোর না হতেই অফিসে গিয়ে হাজির হয়, সেখানে তখন ছু'একটা কল খালি প'ড়ে থাকে। যতক্ষণ লোক না আসে, বালক নিজের মনে তাতে টরা-টক্কা প্র্যাকটিস্ করে।

এমন সময় অকস্মাৎ বালকের জীবনে এলো সেই রহস্যময় লগ্নের শুভযোগ।

কিশোর কার্নেগী রোজ ভোরবেলায় টেলিগ্রাফের টরা-টক্কা শেখবার জন্যে অফিসে গিয়ে হাজির হয়। তখন মেশিন খালি থাকে, টেলিগ্রাফ-অপারেটর কেউই তখন এসে পৌঁছোয়না।

এমনি একদিন ভোরবেলা কিশোর কার্নেগীর জীবনে এলো অকস্মাৎ এক সুযোগ। টেলিগ্রাফ মেশিনের কাছে এসে কার্নেগী দেখে, মেশিন বেজেই চলেছে। নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ জরুরী সংবাদ। অথচ কোনো অপারেটরই তখন অফিসে

নেই। কার্নেগী সাহস ক'রে এগিয়ে যায়...মেশিনে গিয়ে বসে...ফিলাডেলফিয়া, পিটস্‌বার্গকে ডাকছে.. বিশেষ জরুরী দরকার...কার্নেগী নিজেই সে সংবাদ গ্রহণ করলো এবং যথারীতি তৎক্ষণাৎ পিটস্‌বার্গকে জানালো।

অফিসের কর্তা ব্যাপারটা শুনলেন, কার্নেগীকে সেইদিনই টেলিগ্রাফ-অপারেটরের কাজে উন্নীত ক'রে দিলেন। সিঁড়ির এক ধাপ উঁচুতে উঠলো কার্নেগী। টেলিগ্রাফ-অপারেটরের ধাপ থেকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লৌহ-ব্যবসায়ী ধাপ তখনো অনেক-অনেক দূরে...তবুও একটা ধাপ উঁচুতে ওঠা কম কি?

কার্নেগী সারাদিন যেরকম ভাবে অপারেটরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তাতে মনে হয়, জগতে ভালো টেলিগ্রাফ-অপারেটর হওয়া ছাড়া কার্নেগীর কাছে যেন আর কিছু নেই।

সিঁড়ির সবচেয়ে ওপরের ধাপে ওঠবার একমাত্র মূলমন্ত্র হচ্ছে, যে-ধাপে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে হাতের কাছে যে কাজ আছে, সর্ব্বমনপ্রাণ দিয়ে সার্থক ভাবে সেই কাজকেই নিষ্পন্ন করা। কার্নেগী তাই ক'রে চলেন। আপনা-থেকেই অফিসের কর্ত্তাদের দৃষ্টি তাঁর ওপর গিয়ে পড়ে! কাজে যে ফাঁকি দেয়না, অফিসের কর্ত্তা তাকে ভালোবাসবেই।

সেইসময় পেন্‌সিলভানিয়া বেল-কোম্পানী নিজেদের একটা আলাদা টেলিগ্রাফ-লাইন গ'ড়ে তুললেন। কর্ত্তারা ডেকে কার্নেগীকে সেই লাইনের অপারেটর ক'রে দিলেন। সিঁড়ির আর-এক ধাপ ওপরে গিয়ে উঠলেন কার্নেগী। কিছুদিন পরেই বিভাগীয় পরিদর্শকের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদ খালি হলো। কার্নেগীর ভাগ্যেই তা বর্ত্তালো।...আরো আর-এক ধাপ উঁচুতে।

এমন সময় এলো, আর-একটা সুযোগ। যে সুযোগ উদ্যোগী পুরুষকে ঠেলে তুলে দেয় মাঝখানের বহু ধাপ এড়িয়ে, একেবারে উপরের দিকে।

একদিন কার্নেগী ট্রেনে যাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ হলো একজন বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কর্ত্তার। লোকটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একরকম স্লিপিংকারের 'মডেল' তৈরী

করেছেন। কার্নেগী তাঁর বাড়ীতে গিয়ে সেই মডেল'ট দেখলেন,। পনেরো বছর লোকটি যে মডেল তৈরী করেছেন, সেটি যেমন বৈং স দিক থেকে।
তেমনি হয়েছে আরামদায়ক। এই ধরনের গাড়ীর বিশেষ প্রয়োজন, আজ কার্নেগীর দেহে ছিল স্কচ্-রক্ত…ব্যবসায়ীর রক্ত। কার্নেগীর মনে স্তু বাস.. চেয়ে উঠলো, তিনি ব্যবসা করবেন। লোকটির কাছ থেকে তাঁর মডেলটি কিনে নেবার প্রস্তাব করলেন। লোকটিও রাজী হয়ে গেল। এতদিন খেয়ে না-খেয়ে যা-কিছু অর্থ জমিয়েছিলেন, তাই দিয়ে কার্নেগী সেই মডেলটির স্বত্ব কিনে নিলেন। তারপর বহু চেষ্টায় কিছু মূলধন জোগাড় ক'রে নিজের একটা কোম্পানী খুলে বসলেন। 'স্লিপিংকার' তৈরী করার কোম্পানী। রেল-কোম্পানী আদর ক'রে স্লিপিংকার কিনতে লাগলো। তখন কার্নেগীর বয়স—পঁচিশ। সেই কোম্পানী থেকে তিনি বছরে এক হাজার পাউণ্ড ক'রে আয় জমাতে লাগলেন। একেবারে সিঁড়ির মাঝখানের কয়েক ধাপ ডিঙিয়ে ওপরের দিকে উঠে এলেন!

কার্নেগী কিন্তু রেলের কাজ ছেড়ে দেননি। সেখানে ধাপের পর ধাপ উঠতে-উঠতে তিনি আজ হয়েছেন ডিভিসন্যাল সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট। এমন সময় একদিন এলো আর-এক দিক থেকে আর-একটা সুযোগ। তাঁদের রেল-লাইনের একটা কাঠের তৈরী পোল পুড়ে গেল। তার ফলে কয়েকদিন ধ'রে রেল চলাচল বন্ধ রয়ে গেল। কোম্পানীর বিস্তর ক্ষতি হতে লাগলো। এমন সময় স্কচ্ কার্নেগীর মাথায় এলো একটা নতুন মতলব। দূর ভবিষ্যতেব দিকে চেয়ে তিনি বুঝতে পারলেন, সামনে যে-যুগ আসছে, সে-যুগে কাঠ অচল। সামনে যে যন্ত্র-যুগ আসছে, সেখানে কাঠের চেয়ে মজবুত জিনিসের দরকার। দরকার—লোহার। কাঠের পোলে লোহার রেল বেশীদিন চলতে পারেনা। সেইজন্যে দরকার—লোহার-তৈরী পোলের।

কার্নেগী কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে তাঁর এই নতুন মতলবের কথা বললেন, তাদের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার স্বরূপ জোগাড় করলেন এবং তার সঙ্গে নিজের সমস্ত

নেই। কার্নেগী সা‥পান ক'রে একটা নতুন কোম্পানী গ'ড়ে তুললেন, লোহার পোল পিটস্‌বার্গকে ডা‥ নতুন কোম্পানী।

করলো এ‥ই বড় ব্যবসায়ী, যে ঘাড় উঁচু ক'রে দূরের জিনিসকে দেখতে পায় এবং দেখেনা। কার্নেগীও আগত যন্ত্র-যুগের সেই দূরের প্রয়োজনকে সেদিন দেখতে

—কানেগী বিরাট প্রয়োজনের সমস্ত লৌহ সরবরাহের ভার নিলেন।

পেয়েছিলেন এবং ভুল দেখেননি। তার ফলে সেই দরিদ্র তাঁতির ছেলের হাতে এসে গেল আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপ। কার্নেগীর সেই নতুন কোম্পানী প্রথম বছরেই কার্নেগীর হাতে তুলে দিল—দু'লক্ষ পাউণ্ড। তখন তাঁর মাত্র সাতাশ বছর

বয়স, সেইসময় তাঁর আয় হলো, সপ্তাহে দুশো পাউণ্ড ক'রে। পনেরো বছর আগে তাঁর সপ্তাহে আয় ছিল মাত্র—দশ পেন্স।

সিঁড়ির সব-নীচের যে ধাপ থেকে তিনি একদিন জীবন আরম্ভ করেন, আজ বহু নীচে তা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। সামনেই দেখা যাচ্ছে, সিঁড়ির সবচেয়ে ওপরের শেষ ধাপ···জীবনের চরম সার্থকতার শেষ ধাপ। সেখানে গিয়ে পৌঁছোতেই হবে।

তখন ১৮৬২ সাল। আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের জীবনে এলো এক মহা-সন্ধিক্ষণ। সমস্ত দেশ গৃহ-বিবাদে বিভক্ত হয়ে গেল। দেখা দিলো ইতিহাসের ভীষণতম সিভিল-ওয়ার। 'লিনকলন্' তখন যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি।

যুদ্ধের উন্মাদনায় তখন যুক্তরাষ্ট্র তার সৈন্যদেব নিয়ে এগিয়ে চলেছে দেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে। গুটিকতক শহর ছাড়া তখন বিরাট দেশ—অরণ্য আর প্রান্তরেব মাঝখানে পথহীন গ্রামে পরিপূর্ণ। সেইসব গ্রামে যাবার পথ চাই—লৌহ-পথ। কার্নেগী সাড়া দিয়ে ওঠেন সেই যুগের প্রয়োজনে। গ্রাম হয়ে ওঠে শহর···শহরের সঙ্গে শহরের সংযোগ গ'ড়ে তোলে রেল-লাইন। যুক্ত-রাষ্ট্রের সেই অকস্মাৎ বিপুল বিস্তারের পেছনে দেখা দিলো লৌহের প্রয়োজন। কার্নেগী জাতির সেই বিরাট প্রয়োজনের সমস্ত লৌহ-সরবরাহ করবার ভার নিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের সেই বিস্ময়কর আত্ম-বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে বিস্ময়কর ভাবে বিস্তীর্ণ হলো কার্নেগীর লৌহ-ব্যবসায়। মানুষেব ইতিহাসে ব্যবসায়ে আর কোনো মানুষ এমন বিস্ময়কর সৌভাগ্য অর্জ্জন করেনি। লৌহ-সম্রাট রূপে কার্নেগীর নাম আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর আয়ের সংখ্যা, লোকের কল্পনারও উর্দ্ধে উঠে গেল! বর্ত্তমান ধন-তান্ত্রিক জগতে জন্মগ্রহণ করলো নতুন ধরনের একশ্রেণী লোক, কোটী-পতির শ্রেণী। বর্ত্তমান সভ্যতার এক বিস্ময়কর অঙ্গ!

এইসব ব্যবসায়ীদের রীতি-নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতি থেকে গ'ড়ে উঠলো

বর্ত্তমান জগতের ব্যবসায়-বিজ্ঞান। এক-একজন কোটীপতি বর্ত্তমান বিশ্ব-ব্যবসায়ে নতুন-নতুন রীতিনীতি ও পদ্ধতির সংযোজনা ক'রে গিয়েছেন।

কার্নেগীর কর্ম্মপদ্ধতি হলো, নিজের চারিদিকে অভিজ্ঞ, কর্ম্মঠ এবং বিশেষজ্ঞ লোকদের নিযুক্ত রাখা। তিনি যে সব-কাজ নিজেই করতেন, বা নিজেই উদ্ভাবন করতেন, তা নয়। তিনি সবসময় চেষ্টা করতেন, দেশের সবচেয়ে অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ আর পণ্ডিত লোকদের সংগ্রহ করতে, তাঁদের দিতেন বাধাহীন ক্ষমতা আর দিতেন ব্যবসায়ে লাভের অংশ। তিনি জানতেন, কি ক'রে তাঁদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী ও সবচেয়ে ভালো কাজ আদায় ক'রে নেওয়া যায়।

কার্নেগীর জীবন থেকে আমরা বুঝতে পারি, পুঁথিগত-বিদ্যার স্থান আজকের জগতে কতখানি অপ্রয়োজনীয়। তিনি ছেলেবেলায় মাত্র চার বছর পুঁথিপত্র ঘেঁটেছিলেন।

স্কুল-কলেজের বাইরে সকল কাজের মধ্যে থেকে তিনি বিদ্যা-চর্চ্চা করতেন। অসাধারণ ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি। জগৎ-খ্যাত স্কচ্-কবি বার্নসের সমস্ত কবিতা তিনি মুখস্থ বলতে পারতেন। শেক্সপীয়ারের হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, কিংলিয়ার আর রোমিও-জুলিয়েট, তিনি আগাগোড়া মুখস্থ বলতে পারতেন। স্বর্ণের অন্বেষণে তিনি অন্তরের স্বধর্ম্মকে ভুলে যাননি।

কার্নেগীর মতন ধনী ব্যবসায়ী বর্ত্তমান যুগে আর কেউ নেই। একান্ত দরিদ্র অবস্থা থেকে তিনি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী হয়েছেন। কিন্তু ঐশ্বর্য্যের সর্ব্বোচ্চ শিখরে এসে তিনি বললেন, 'ধনী হয়ে এই পৃথিবী ত্যাগ করা সবচেয়ে দৈন্যের কথা!'

তাই তিনি যেমন আগ্রহে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন, তেমনি আগ্রহে সেই সঞ্চিত অর্থ বিতরণ করতে লাগলেন।

কার্নেগীর জীবনের আসল রূপ হচ্ছে সেইখানে, যেখানে তিনি আহৃত অর্থকে বিশ্বের সেবায় বিতরণ ক'রে গেছেন। শুধু নিজের দেশের জন্যে নয়, তিনি

ভেবেছিলেন, এই বিপুল অর্থ বিশ্বের সকল জাতির লোকের জন্যে। মানুষের কল্যাণের জন্যে, মানুষের কাল্‌চারের অগ্রগতির জন্যে তাঁর দান মানব-সভ্যতার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে। পঁচাত্তর মিলিয়ান পাউণ্ড তিনি জীবদ্দশায় দান ক'রে গিয়েছেন।

সুদূরতম দক্ষিণ মহা-সাগরের দ্বীপস্থ দরিদ্র লোকেরা যখন হাসপাতাল থেকে বিনা অর্থে ওষুধ পায়, যখন দূরতম দেশের দবিদ্র ছেলেরা উচ্চশিক্ষার জন্যে দেশ-দেশান্তরে যায়, তখন তারা জানেনা, তাদের সেই সৌভাগ্যের পেছনে আছে—কার্নেগীর দান।

কিভাবে তাঁর অর্থ উপযুক্ত ভাবে দানে ব্যয়িত হতে পারে, তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পন্থা আবিষ্কারের জন্যে কার্নেগী আমেরিকার বড়-বড় সংবাদপত্রে প্রতিযোগিতা আহ্বান করেন। শিক্ষা-বিস্তাবেব জন্যে 'রকফেলার' ছাড়া জগতে আর কোনো একজন লোক এত অথ দান ক'রে যেতে পারেননি।

সঞ্চয়ে এঁদের যেমন ছিল আনন্দ, তেমনি আনন্দ ছিল—বিতরণে।

জীবনে কোনো দিন কোনো গির্জ্জায় যাননি, কিন্তু আমেরিকার সাত-হাজার গির্জ্জায় তাঁর দেওয়া অর্গান আজও বাজছে···

সবচেয়ে আশ্চয্য, একটা দু-হাজাব বছরেব সাধনা আর সভ্যতা নিঃশব্দে তিলে-তিলে আমাদের মধ্যে মবে যাচ্ছে, এই মহাভয়াবহ ঘটনাব বোধ পর্য্যন্ত আমাদের নেই।

———

উইলিয়াম হার্ষ্ট

...কি ক'রে হয়, বা কি ক'রে হলো, তা জানি না...শুধু এইটুকু জানি, জগতে কোনো-এক জায়গায়, কোনো একজন লোকের জীবনে সত্যি-সত্যি ঘটেছে.. মানুষ খবরের কাগজের ব্যবসা ক'রে প্রতিদিন ৬০ হাজাব পাউণ্ড ক'রে অর্থ উপার্জ্জন করেছে বা করছে...অর্থাৎ এই কথাটা পড়তে আপনাব যতটুকু সময় লাগলো, তার মধ্যে তাঁর দুশো টাকার ওপর আয হয়ে গিয়েছে। সেই অসাধারণ সৌভাগ্য-শালী লোকটির নাম হলো—উইলিয়াম র‍্যানডল্‌ফ হার্ষ্ট, জগতের মধ্যে সবচেয়ে

ধনী এবং সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সংবাদপত্রওয়ালা। আমেরিকায় হেন লোক নেই, যে হার্ষ্টকে জানেনা, হার্ষ্টকে ভালোবাসেনা।

আমাদের কাছে রূপ-কথার গল্পের মতন শোনায়। মনে হয়, আমরা যে দুনিয়াকে জানি, যে দুনিয়াতে আমরা বাস করছি, এ যেন সে-দুনিয়ার কথা নয়। আর-এক নতুন কোনো পৃথিবীর ব্যাপার, যে-পৃথিবীতে যাবার পথ আমাদের জানা নেই। এই মানুষ, এই কাগজ, এই কালি-কলম, এই ছাপাখানা, এই ধরনেরই লেখা, একই লেখার প্রতিভা—কিন্তু এক দেশে তা লেখককে এনে দেয় লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা, আর আমার দেশে এনে দেয়না একটা কাণা কড়িও। আমাদের দেশেও কাগজ বেরোয়, কাগজের ব্যবসা চলে, কিন্তু অধিকাংশ কাগজ ঋণের দায়ে উঠে যায়, পাঠকের অভাবে আঁতুড়ঘরেই মরে যায়, আর যারা টিকে থাকে, কি নিদারুণ উঞ্ছবৃত্তি করেই তাদের টিকে থাকতে হয়! আঙুলে গোণা যায় এমন কয়েকখানি কাগজ ছাড়া আমাদের অধিকাংশ কাগজেব গ্রাহক-সংখ্যা যা, তা এমনি অবিশ্বাসকর সামান্য, যে, তা লুকিয়ে রাখবার জন্যে কাগজের মালিকদের প্রাণান্ত চেষ্টা করতে হয়। কাগজের কাটৃতি আর আয় যেখানে এত তুচ্ছ, সেখানে সেই কাগজের ব্যবসায়ে যাঁরা সংযুক্ত, অর্থাৎ লেখক, সম্পাদক, সাহিত্যিক ইত্যাদি—তাঁদের আয় আর কি হতে পারে?

আমেরিকার সুবিখ্যাত সাহিত্যিক 'সিন্‌ক্লেয়ার লুইস' যখন নোবেল-প্রাইজ পেয়ে, ষ্টক্‌হলমে নোবেল-প্রাইজ উৎসবের অধিবেশনে বক্তৃতা দেন, তিনি বলেছিলেন, 'আমরা অর্থাৎ আমেরিকান-সাহিত্যিকরা, আমরা জানিনা—দারিদ্র্য কাকে বলে!' আমেরিকার সমুদ্র-সৈকতে অবসর-বিনোদনের জন্যে স্বতন্ত্র ভাবে একখানা ক'রে বাড়ী নেই, এমন নাম-করা সাহিত্যিক আমেরিকায় একজনও নেই।

একই কালে, একই বিশ্ব-ব্যবস্থায়, একই পৃথিবীতে বাস করছি আমরা আর তাঁরা, এই কথার সঙ্গে যখন আমাদের অবস্থা-তারতম্যের কথা মিলিয়ে দেখি, তখন সত্যি মনে হয়না যে, আমরা বর্ত্তমান সভ্যতার পরিধির মধ্যে বাস

করছি। 'নজরুল ইসলাম'-এর সাহিত্য-জগৎ, আর 'উইলিয়াম হার্ষ্ট'-এর সাহিত্য-জগৎ কখনই এক পৃথিবীতে নয়।

আজ অবশ্য আমরা দেখছি, আমাদের দেশে কোনো-কোনো ধনী—হার্ষ্টের অনুকরণে মুদ্রণ আর প্রকাশের ব্যবসায়ে 'মনোপলী' ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চলেছেন, টাকার জোরে অন্য-সব কাগজের স্বত্ব কিনে নিয়ে···হার্ষ্টের মতন 'পেপার-কিং' হতে চলেছেন···কিন্তু দেশের চারদিকের অপরিবর্ত্তিত পরিবেশের মধ্যে তাঁদের এই আত্মস্ফীতি দেখে মনে পড়ে, মানুষের দেহে কুঁজের স্ফীতির কথা, কিংবা বিশেষ কোনো সম্প্রদায়ের মেদ-সমৃদ্ধ ভুঁড়ির কথা, একটা জঘন্য অস্বাভাবিক ব্যাপার। যে সার্ব্বজনীন শিক্ষা ও অনুশীলন-বৃত্তির স্বাভাবিক বিকাশের ফলে, সমাজের অন্য-সব অঙ্গের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সে-দেশে হার্ষ্টের মতন লোকের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে, আমাদের দেশে তার কোনো চিহ্নই নেই। দেহের অন্য-সব অঙ্গ—হাত-পা, বুক, মুখ সমস্ত শীর্ণ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে, তার মধ্যে যদি শুধু ভুঁড়িটাই কোনো রকমে ফুলে-ফেঁপে ওঠে, সেটাকে দেহের স্বাস্থ্যের লক্ষণ ব'লে মনে করবার কোনো কারণই নেই, সেটা হলো দেহের মারাত্মক ব্যাধিরই লক্ষণ। প্রকাশকের ব্যবসায়ে যদি একজন লোক মাসে ত্রিশ লক্ষ টাকা রোজগার করে, অথচ সেই ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান যারা জোগায়, সেই সাহিত্যিক আর লেখক-সম্প্রদায় যদি না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে যায়, তাহ'লে সেই ব্যবসায়ীর আত্মস্ফীতিতে গৌরব করবার কিছু থাকেনা।

তাই আমাদের দেশে হার্ষ্টের আবির্ভাব—দেশব্যাপী অশিক্ষার সুগভীর অন্ধকারের আড়ালে সুপ্ত হয়ে আছে। এমনি অচল অনড় হয়ে আছে সেই অন্ধকারের পাহাড়—জানিনা কবে তা ঘুচবে। ইতিমধ্যে দূর থেকে চেয়ে দেখি—হার্ষ্টকে, যেমন পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে লোকে দেখে দূর নক্ষত্রকে······

শুনি, হার্ষ্টের বিস্ময়কর জীবন-কাহিনী, যেমন ক'রে শিশু শোনে, বৃদ্ধা ঠাকুরমার কোলে ব'সে রূপ-কথার রাজার কুমারের কাহিনী······

বিংশ শতাব্দীর অভিনব রূপ-কথা জুগিয়ে চলেছে আমেরিকা···আর ঠাকুরমার কোলে ব'সে আমরা সেই বিচিত্র কাহিনী শুনে চলেছি···

রূপ-কথা নয়তো কি ?

খবরের কাগজের ব্যবসা ক'রে হার্ষ্ট অবসর-বিনোদনের জন্যে একটা জমিদারী কিনেছেন, সে জমিদারীর আয়তন হলো, আড়াই লক্ষ বর্গ একর, প্রশান্ত-মহাসাগরের ধারে পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ অপরূপ সৌন্দর্য্যময় এক ভূখণ্ড। এ হচ্ছে, হার্ষ্টের অসংখ্য সম্পত্তির মধ্যে একটা মাত্র ব্যাপাব।

প্রশান্তমহাসাগরের তীরে এই বিরাট ভূ-খণ্ডকে নিয়ে তাঁব সৌন্দর্য্য-বিলাস মেটাবার জন্যে তিনি নিজের শিল্প-বুদ্ধি দিয়ে বিচিত্র সব প্রাসাদ তৈরী করিয়েছেন। সমুদ্র থেকে দু'হাজার ফিট উঁচু ছোট-ছোট পাহাড়ের চূড়ায় নিজে ডিজাইন ক'রে প্রাচীন স্থুর-শিল্পের অনুকরণে কতকগুলি প্রাসাদ তৈরী করিয়েছেন, প্রত্যেকটি প্রাসাদ, শিল্প-সৌন্দর্য্যের নিখুঁত প্রকাশ···সেই প্রাসাদময়ী পর্ব্বতমগুলের নাম দিয়েছেন, The Enchanted Hill—মায়াশৈল! সারা জগৎ থেকে শিল্পকলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সব নিদর্শন সংগ্রহ ক'রে প্রাসাদের প্রত্যেকটি কক্ষকে সাজিয়েছেন। যে বিরাট হলঘরে ব'সে হার্ষ্ট মায়াশৈলে তাঁর আমন্ত্রিত বন্ধুদের আপ্যায়িত করেন, তার দেয়ালে টাঙানো—মাইকেল এঞ্জেলো, র‍্যাফেল আর ডাভিঞ্চির মূল সব চিত্র। প্রত্যেকটি আসবাব, জগতের বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন যুগের স্মৃতি-বিমণ্ডিত। যে টেবিলে অতিথিরা বসেছেন, সে-টেবিলে হয়তো একদিন 'চতুর্দ্দশ লুই' তাঁর বন্ধুদের নিয়ে পান-ভোজন করেছিলেন, সামনে যে বিচিত্র কৃষ্ণ-প্রস্তরের আলোক-দানিতে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে, সে আলোক-দানি হয়তো তিন হাজার বছর আগে কোনো রোমক-সম্রাটের কক্ষ-শোভা বর্দ্ধন করতো, যে পান-পাত্রে গৃহস্বামী অতিথিদের স্বাস্থ্যপান করছেন, একদিন সেই পান-পাত্রে 'নেপোলিয়ান' তৃষ্ণা দূর করেছেন।

আহারের পর দ্বিপ্রহরে অতিথিরা মায়াশৈলের প্রান্তরে বেড়াতে বেরুলেন,

কিছুদূর গিয়েই চোখে পড়লো, গভীর খাদের ওপারে স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে জগতের যত বিচিত্র প্রাণী···জগতের প্রত্যেক দেশের অরণ্য থেকে সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এসেছেন অরণ্যবাসী প্রাণীদের,—একটা দুটো নয়, দলে-দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে আফ্রিকার জেব্রা, অষ্ট্রেলিয়ার জিরাফ, হিমালয়ের নীলগাই, গুজরাটের সিংহ, সুন্দরবনের বাঘ। অন্যদিকে বিরাট হ্রদের ওপর, নানা বিচিত্র গাছে উড়ে বেড়াচ্ছে হাজার রকমের পাখী, হ্রদের ধারে-ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে অসংখ্য জলচর প্রাণী।

জগতের কোনো-কোনো বড়লোকের হয়তো পশু-পাখী পোষার সখ আছে, কিন্তু এমন বিরাট সংগ্রহ আর কারুরই নেই। এবং এ সংগ্রহ শুধু একটা খেয়াল মেটাবার জন্যে নয়, এই বিরাট পশুশালাব প্রত্যেকটি প্রাণীর সঙ্গে এই বিচিত্র লোকটি আত্মীয়তা স্থাপন করবার চেষ্টা করেন। তাদের প্রত্যেকের সুখ-দুঃখের কথা—এই লোকটি নিজের মানুষ-আত্মীয়ের সুখ-দুঃখের মতন ভাবেন।

একবার হলিউডের বড়-বড় সিনেমা-কর্তারা বিশেষ প্রয়োজনে হার্ষ্টের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যে তাড়াতাড়ি এরোপ্লেন ক'রে মায়াশৈলে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা এসে শুনলেন, হার্ষ্ট ব্যস্ত আছেন, তাঁদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে। এবং সেই ক্রোরপতির দল অপেক্ষা ক'রে থাকতে বাধ্য হলেন, কারণ, হার্ষ্ট তখন তাঁর অতি-প্রিয় একটা টিকটিকির সেবায ব্যস্ত ছিলেন, বেচারার ল্যাজ খ'সে যাওয়ায় যন্ত্রণায় ছটফট করছিল। হার্ষ্ট তার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে, খাইয়ে-দাইয়ে শান্ত ক'রে তবে দেখা করতে এলেন। আর-একবার তখন মাঝ-রাতে ঘুমুচ্ছেন, হঠাৎ তাঁর পোষা একটা 'গিনিপিগের' কান্নায় তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তক্ষুণি শয্যা ছেড়ে উঠে পড়লেন হার্ষ্ট। দেখলেন, গিনিপিগটার একটা পা হঠাৎ ভেঙে গিয়েছে···যন্ত্রণায় অব্যক্ত চীৎকার করছে সে। সেই মাঝ-রাতে তক্ষুণি তিনি তাঁর ষ্টিমবোট ক'রে লোক পাঠালেন ডাক্তার আনতে এবং একশো পাউণ্ড ফী দিয়ে সেই রাত্তিরে ডাক্তার আনালেন। শুধু একটা গিনিপিগের পা ভেঙে গিয়েছিল ব'লে।

যে-দেশে মানুষ ওষুধের অভাবে রাস্তায় মরে প'ড়ে থাকে, সে-দেশের লোকের কাছে এই কাহিনী বলতেও মর্ম্মান্তিক বেদনা লাগে।

হার্ষ্টের এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের পেছনে আছে এক দুঃসাহসী কৃষকের জীবন-সাধনা...দুঃসাহসী মানুষের দুর্জ্জয় পণ।

সে-কৃষক হলেন তাঁর পিতা। হার্ষ্ট সামান্য এক কৃষকের সন্তান। কিন্তু সে-কৃষকের বুকে ছিল দুর্জ্জয় দুঃসাহস...ছিল অরণ্য কেটে পথ তৈরী করার হিম্মত, বিরূপ-ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করার দুর্দ্দম তেজ। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, আমেরিকা যখন অরণ্য কেটে নগর তৈরী করছিল, সেইসময় এই দুঃসাহসী কৃষক ঘর-দোর ছেড়ে নিজের ষাঁড়-টানা গাড়ীতে ক'রে ভাগ্যের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েন। দু'হাজার মাইল অরণ্য-পথ অতিক্রম ক'রে, বন্যপশু আর রেড-ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে একদিন তিনি পেলেন যার অন্বেষণে বেরিয়েছিলেন মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে।...পেলেন আমেরিকার জনহীন অরণ্যের মধ্যে স্বর্ণ-খনির সন্ধান। সেই স্বর্ণ-খনি পরিবর্ত্তিত ক'রে দিলে তাঁর জীবন। রেখে গেলেন তিনি তাঁর ছেলের জন্যে বিপুল ঐশ্বর্য্য, যা দিয়ে তাঁর ছেলে 'হার্ষ্ট' জগতের সংবাদপত্র-ব্যবসায়ে নিয়ে এলেন যুগান্তর।

হার্ষ্ট একটি-একটি ক'রে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রের মধ্যে চব্বিশটির স্বত্ব কিনে নিলেন এবং সেইসঙ্গে ন'টি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিকপত্রিকারও মালিক হলেন। সেইসব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে হার্ষ্ট তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব আর প্রতিভা দিয়ে একসূত্রে গেঁথে রেখেছেন, আর সেইসব সংবাদপত্রের মাধ্যমে তিনি আমেরিকার জনসমাজে যে-প্রভাব বিস্তার ক'রে আছেন, আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ছাড়া আর কোনো একজন মানুষের এতখানি প্রভাব নেই!

হার্ষ্টের বাবা যে বাড়ী তৈরী ক'রে গিয়েছিলেন, হার্ষ্ট নিজে সেই বাড়ীতেই থাকেন। একদিন সেই বাড়ীর জানলায় এসে দেখেন, সামনের বাগানে একটা গাছ এমন বেড়ে উঠেছে যে, তার ফাঁক দিয়ে সমুদ্রকে ভালো ক'রে দেখা যায়না। সমুদ্রের

সঙ্গে তাঁর মনের নিগূঢ় মিতালি। আমেরিকার সবচেয়ে বড় কথা—ব্যবসায়ী ব্যক্তিগত-জীবনে সবচেয়ে কম কথা বলেন। তাই তাঁর প্রিয় অবসর-বিনোদন হলো—সমুদ্রের দিকে চেয়ে নীরবে ব'সে থাকা। সমুদ্রকে যারা ভালোবাসে, নীরবে চলে তাদের সঙ্গে সমুদ্রের কথোপকথন। তাই সেই বৃদ্ধ-বৃক্ষটিকে নিয়ে হার্ষ্ট বিপদে পড়লেন। সমুদ্র আর তাঁর মাঝখানে সে বাধা হয়ে উঠেছে। অথচ বৃক্ষটির ওপরও তাঁর কম মমতা নয়। সেই বৃক্ষটির তলায় ব'সে তাঁর পিতা জীবনের সায়াহ্ন-অবসর ভোগ ক'রে গিয়েছেন। তার প্রত্যেক পাতাটির সঙ্গে পিতার স্মৃতি বিজড়িত। তাই তাকে আঘাত করার কথাও তিনি কল্পনা করতে পারলেননা। তিনি কয়েকজন বড় ইঞ্জিনীয়ারকে ডেকে পাঠালেন এবং তাঁদের ওপর ভার দিলেন, একটি পাতাও নষ্ট না ক'রে সমূল বৃক্ষটিকে ত্রিশ ফিট দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তারপর আট হাজার পাউণ্ড খরচ ক'রে হার্ষ্ট সেই গাছটিকে আঘাত না ক'রে, ত্রিশ ফুট দূরে সরিয়ে রাখলেন। দৃষ্টির সামনে থেকে স'রে গেল সমুদ্র দর্শনের বাধা।

আমাদের কাছে এ হলো রূপ-কথা ··বিংশ শতাব্দীর রূপ-কথা।

ম্যাডাম কুরী

দুঃখ, দৈন্য, অনাহার, উপবাস—এই বিষয়গুলির সঙ্গে আমাদের অধিকাংশ লোকেরই ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। দরিদ্র-দেশের সন্তান আমরা, দারিদ্র্যে জন্মাই, দারিদ্র্যে জীবন ধারণ ক'রে থাকি, দারিদ্র্যে মরি।

যখন দেখি, পুঁথিতে বলছে—দারিদ্র্য ভগবানেরই দান, যখন শুনি, ভোজন-তৃপ্ত প্রচারক উপদেশ দিচ্ছেন—দারিদ্র্যে মুহ্যমান হয়োনা, তখন স্বভাবতই মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। দু'বেলা পেট ভর্ত্তি ক'রে যারা খেতে পায়, তারা অনায়াসে দারিদ্র্যের এইরকম উপদেশ দিতে পারে। চোখ চাইলেই চারদিকে যেসব দরিদ্র
। ছাড়া
লোকদের দেখি, তাদের চেয়ে কুৎসিত, তাদের চেয়ে শক্তিহীন, তা
তাই, আলোও
অপদার্থ আর কিছুই দেখতে পাইনা। সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাধির
কার। শীতের দিন
দেখলে শিউরে উঠি। এই দারিদ্র্য যদি ভগবানের দান হয়
কাটায়, অনাবৃত-হাতের
আশে-পাশে এই যে শত-সহস্র দরিদ্র লোক, কেন তারা
থেকে নীচে, বহু নীচে, পশুরও অগম্য স্তরে নেমে যা

দারিদ্র্য সম্বন্ধে সমস্ত হিতোপদেশকে মনে হয় এক বিরাট মিথ্যার জঘন্যতম নির্লজ্জ প্রচার-কার্য্য···জগতের অধিকাংশ বঞ্চিত লোকদের সম্মোহিত ক'রে রাখবার জন্যে মুষ্টিমেয় পরিতৃপ্তদের ষড়যন্ত্র। দারিদ্র্য মানুষকে দেয় সংগোপন আত্মিক-শক্তি—চারদিকের মনুষ্য-নামধারী জড় পদার্থগুলিকে দেখে মনে হয়, এত বড় নির্লজ্জ রসিকতা মানুষ সজ্ঞানে করে কি ক'রে?

কিন্তু, আবার মনে সন্দেহ জাগে. যত দূরে পাই সভ্য মানুষের চিহ্ন, তত দূরে পিছিয়ে যাই। শতাব্দীর পর শতাব্দী সর্ব্বত্র দেখি, মানুষ দারিদ্র্যকে সেইভাবেই দেখেছে···পাঁচ হাজার বছর ধ'রে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন জাতির লোক কি ক'রে এই একই রসিকতা ক'রে যেতে পারে ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে যাই। এরকম নির্লজ্জ রসিকতার পরমায়ু কখনো পাঁচ হাজার বছর হতে পারে?···তবে?

এই প্রশ্নের উত্তরের জন্যেই মানুষের জীবন-কাহিনী পড়তে সুরু করি, দেখতে চেষ্টা করি প্রতিদিনের মানুষকে তার ভেতরে গিয়ে।

সেখানে দেখলাম, দুঃখকে যে-মর্য্যাদা দেওয়া দরকার, অধিকাংশ দুঃখী লোক তা দিতে পারেনা, তাই দুঃখও তাদেরকে দুঃখ ছাড়া আর কিছু দেয়না। দুঃখকে যে দিতে পেরেছে তার পুরো মর্য্যাদা, দুঃখও ভ'রে দিয়েছে তার শূন্য জীবনকে ক্ষয়হীন ঐশ্বর্য্যে ভরাট ক'রে। দুঃখ—বরদাতা দেবতার মতন যে ঐশ্বর্য্য দিতে পারে, কোনো সুখের দেবতা তার শতাংশের একাংশও দিতে পারেনা। দুঃখকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করতে হয়। সে আশুতোষ নয়। বড় কঠিন তার

তাই খুব কম দুঃখী লোকই দেখতে পায় তার বরদাত্রী রূপ।

ংখ বরদাত্রী, যে দুঃখ মহৎ, যে দুঃখের স্তবগান গেয়ে গিয়েছেন

দুঃখ কোনো আপোষ সহ্য করতে পারেনা, এতটুকু আপোষে

গনি, তার উপবাসের মধ্যে নেই ভিক্ষার অন্ন, তার রিক্ততার

ন, তার বৈরাগ্যের মধ্যে নেই 'ঝুলি'র বিলাস। তার

কোনো করুণা-ভিক্ষায় নত হয়না কারুর দ্বারে। সে

যখন কাঁদে, কাঁদে আত্মার নির্জ্জনতায়, যাতে তার কান্নার শব্দ না পৌঁছোয় কারুর কানে। তার আভিজাত্যের নিঃসঙ্গতার চূড়ায় সে বিচরণ করে একাকী। তার রিক্ততায় থাকেনা বিন্দুমাত্র ক্ষুদ্রতা। সে উপবাস দেয়, কিন্তু ভিক্ষুক হয়না।

আমরা পৃথিবীর অধিকাংশ দুঃখী লোক, অষ্টপ্রহর উন্মাদের মতন ঘুরছি আপোষের জন্যে, মুষ্টি-ভিক্ষার জন্যে, করুণার জন্যে···লোকের দ্বারে গিয়ে কাঁদছি! আমাদের চলার পথ আমাদের চোখের জলে পিছল। দুঃখ পেলেই আমরা ভিখারী হয়ে যাই, মুষ্টি-ভিক্ষায় সন্তুস্ট হযে ফিরে আসি, আবার মুষ্টি-ভিক্ষায় বেরোই।

মুষ্টি-ভিক্ষা যে চায়, কে দেবে তাকে কুবেরের ঐশ্বর্য্য? তাই দুঃখ তার কাছে শুধু দুঃখই।

এই অধিকাংশ দুঃখী লোকদের মধ্যে ক্বচিৎ কখনো এমন দু-একজন দেখি, যারা সত্যিকারের করেছে দুঃখ-সাধনা, যারা নিজের জীবনে দিয়েছে দুঃখকে পূর্ণ মর্য্যাদা, দেখি, তাদেরই জীবনে দুঃখ-সাধনার অন্তে ঝল্‌সে উঠেছে দুঃখের-দেওয়া বিপুল বিত্ত, বৃহৎ-দুঃখের অন্তর থেকে তারা এনেছে মহৎ-প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে।

দুঃখ হলো বৃহৎ সাধনা. যে-সাধনায় নেই কোনো ক্ষুদ্র আপোষ।

আজ যাঁর জীবন-কথা বলতে চলেছি, তিনি ছিলেন এইরকম 'দুঃখ-সাধিকা। 'ম্যাডাম কুরী' তাঁর নাম। সমগ্র মানব-সভ্যতার ইতিহাসের আর কোনো নারী তাঁর মত মস্তিষ্কের দানে পৃথিবীকে সমৃদ্ধতর ক'রে যেতে পারেননি।

প্যারিসের উপকণ্ঠে এক এঁদো গলির ভিতর এক পুরনো ভাঙা বাড়ীর একতলায় অন্ধকার একটা ঘর। ঘর নয়—একটা গর্ত্ত। কারণ, দরজা ছাড়া সেই ঘরে আলো-বাতাস আসবার আর কোনো জানলা নেই। তাই আলোও আসেনা, বাতাসও আসেনা। সব সময় থাকে একটা ভিজে অন্ধকার। শীতের দিন সেই ভিজে অন্ধকার—দেহের ভিতরকার হাড়ে গিয়ে সূঁচ ফোটায়, অনাবৃত-হাতের আঙুল অবশ হয়ে যায়।

সেই ঘরে বাস করে এক তরুণী মেয়ে, বিজ্ঞান-কলেজের ছাত্রী। কয়লা কেনবার তার পয়সা নেই, তাই সমস্ত শীত সেই ঘরে বিনা আগুনেই থাকতে হয় তাকে। কলেজ থেকে আসবার পর এক টুক্‌রো কি দু'টুক্‌রো শুকনো রুটি খায়, তার সঙ্গে এক কাপ পাতলা চা, বা কফি। তাও আজ তিন দিন জোটেনি! নিরুপায় ছাত্রী তাই পয়সা-চারেকের মূলো কিনে রেখেছে। পেটে যখন খুব খিদের যন্ত্রণা হয়, তখন সেই মূলো চিবিয়ে-চিবিয়ে খানিকটা ক'রে খায়, আর সেই অবস্থায় অঙ্ক ক'ষতে বসে।

একদিন সে শীত আর সহ্য করতে পারেনা। খালি কাঠের তক্তাপোশের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ে···ছেঁড়া ময়লা যা-কিছু পোষাক ছিল, সমস্ত গায়ের ওপর চাপায়···তাতেও হাড়ের কাঁপুনি যায়না! তখন কলেজের বইগুলো নিয়ে বুকের ওপর চাপিয়ে রাখে, ভাঙা চেয়ারটা উল্‌টে গায়ের ওপর ফেলে রাখে, তারপর কখন একসময় অজ্ঞান হয়ে যায় জানতে পারেনা। মূর্চ্ছিত অবস্থায় বেঁচে যায় শীতের যন্ত্রণা থেকে, কারণ, শীত-গ্রীষ্ম কোনো বোধই তখন থাকেনা।

এই অবস্থায় সেই তরুণী মেয়েটি রোজ কলেজে যায়-আসে। তার অবস্থার কথা কেউই জানেনা, কাউকেই কোনোদিন জানায়নি সে। বন্ধুত্ব করলে পাছে কারুর চোখে ধরা পড়ে তার এই অবস্থা, তাই সে কারুরই সঙ্গে বন্ধুত্ব করেনা। বন্ধুত্ব করবার অবকাশ তার নেই। যেটুকু অবকাশ, সবই নিয়োজিত হয় বিজ্ঞানের অনুশীলনে। বিজ্ঞান তাকে আয়ত্ত করতে হবে, সেই তার একমাত্র ধ্যান—জ্ঞান—ধারণা।

এই তরুণীই পরে জগতে 'ম্যাডাম কুরী' নামে পরিচিত হন্।

ম্যাডাম কুরী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে কৃতিত্ব অর্জ্জন করেছেন, জগতের আর কোনো নারীই সাহিত্য, শিল্প, বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুরূপ কৃতিত্ব দাবী করতে পারেননা। নারীর প্রকৃতিগত বা সমাজগত সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে ম্যাডাম কুরী প্রতিভার ক্ষেত্রে, অনুশীলনের ক্ষেত্রে সার্ব্বজনীন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজের

শ্রেষ্ঠতাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। যা কোনো পুরুষ-প্রতিভার ভাগ্যে ঘটেনি, নারী হয়ে তিনি তা অর্জ্জন করেছেন। তিনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দু-দু'বার 'নোবেল প্রাইজ' পান। প্রথম ১৯০৩ সালে পদার্থ-বিজ্ঞানে, দ্বিতীয়বার ১৯১১ সালে রসায়ন-বিজ্ঞানে। একসঙ্গে বিজ্ঞানের দু'টি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই জীবনে এইরকম পারদর্শিতা, জগতের ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়।

কিন্তু যে-কথা আমি এই কাহিনীর সূচনায় বলছিলাম, ম্যাডাম কুরীর জীবন আমার কাছে শুধু এই বৈজ্ঞানিক-কৃতিত্বেব দরুণই অনন্যসাধারণ বোধ হয়নি; তাঁর বৈজ্ঞানিক-কৃতিত্বেব কথা বাদ দিয়ে, যেভাবে তিনি জীবন-যুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন, তাঁর সেই জীবন-ধর্ম্মই তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে আছে। একদিকে তিনি যেমন ছিলেন অনন্যসাধাবণ একজন বৈজ্ঞানিক, অন্যদিকে তিনি ছিলেন তেমনি অনন্যসাধারণ একজন শিল্পী। জীবন-শিল্পী। জীবন-শিল্পী হিসাবেই তাঁর জীবন আমাব কাছে অনন্যসাধারণ।

আজ সমস্ত শিল্পী-অনুশীলনের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় শিল্প—জীবনকে গ'ড়ে তোলার শিল্প, আমাদের দেশে সেইটেই সবচেয়ে অবজ্ঞাত অবস্থায় প'ড়ে আছে। অথচ আমাদের দেশই একদিন এই জীবন-শিল্পকে সবচেয়ে বেশী মর্য্যাদা দিয়েছিল, আমাদেব দেশেই নিখুঁত ভাবে তার বৈজ্ঞানিক-অনুশীলন একদিন হতো। জীবনকে নিখুঁতভাবে গ'ড়ে তোলাব জন্যেই আমাদের শাস্ত্রের আব সমাজের ছিল সহস্র সজাগ চেষ্টা। আজ সেই জীবন-শিল্পের চেতনা পর্য্যন্ত আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তাই আজ সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে চেষ্টা করছি, আমাদের তরুণ-তরুণীদের সামনে তুলে ধরতে সেইসব জীবন-শিল্পীদের, যাঁরা সুন্দর ক'রে গ'ড়ে গিয়েছেন তাঁদের জীবনকে।

ম্যাডাম কুরী ফ্রান্সের মেয়ে নন্। ফ্রান্স হলো তাঁর বিমাতা। কিন্তু বিমাতার স্নেহে তিনি নিজের জননীর অভাবকে গিয়েছিলেন ভুলে। ফ্রান্সকেই তিনি গ্রহণ করেন তাঁর জননী হিসাবে।

তিনি জন্মগ্রহণ করেন য়ুরোপের এক হতভাগ্য জাতির ঘরে, যে-জাতি প্রতিভার ধাত্রী হলেও ইতিহাসে অবজ্ঞাত—লাঞ্ছিত। তিনি জন্মগ্রহণ করেন, পোলাণ্ডে, এক পোল-অধ্যাপকের ঘরে। যে-নামে তিনি জগতে পরিচিত, সে-নামের সঙ্গে তাঁর জন্মসূত্রে-পাওয়া নামের কোনো মিল নেই। জন্মসূত্রে তাঁর নাম হলো—মানিয়া শ্‌ক্লোডৌস্কা।

তাঁর পিতা অধ্যাপক শ্‌ক্লোডৌস্কা ছিলেন একজন দুরন্ত আদর্শবাদী, এবং আজকের জগতে আদর্শবাদীদের সাংসারিক অবস্থা যা হয়, তাঁরও সাংসারিক অবস্থা ছিল সেইরকম অস্বচ্ছল। তাব জন্যে ম্যাডাম কুরীকে জীবনের প্রথম দিন থেকেই নিদারুণ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়।

উনিশ বছরের মেয়ে কলেজে পড়ে, কিন্তু পড়ার খরচ জোগাবার ক্ষমতা নেই সংসারের। তাই তিনি এক বড়লোকের বাড়ীতে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিলেন। বড়লোকের দশ বছরের মেয়ে, তারই গৃহ-শিক্ষয়িত্রী রূপে তিনি সেই বাড়ীতে যাতায়াত করেন। অবসর সময়ে নিজের পড়া-শোনা করেন।

ছুটির সময় গৃহকর্ত্তার পুত্র কলেজ থেকে বাড়ীতে ফিরে এলেন। বাড়ীতে এসে সেই তরুণী শিক্ষয়িত্রীকে দেখে তরুণ যুবা মুগ্ধ হয়ে সেই শিক্ষয়িত্রীকে বিয়ে করবার প্রস্তাব তুললেন। যুবার ধনী মা-বাপ যখন পুত্রেব সেই প্রস্তাব শুনলেন, তাঁরা খড়গহস্ত হয়ে উঠলেন। সামান্য একজন গৃহ-শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে তাঁদের মতন ধনী ও অভিজাতশ্রেণীর ছেলের বিয়ে তাঁরা কল্পনাও করতে পারেননা।

ম্যাডাম কুরী যখন সেই অপমানজনক প্রত্যাখ্যানের বিষয় জানতে পারলেন, তিনি মর্ম্মাহত হলেন। কিন্তু সেই অপমানের জন্যে তিনি কোনো আক্ষেপই করলেননা। আক্ষেপ করলেননা বটে, কিন্তু সেই দণ্ডে তিনি পোলাণ্ড ত্যাগ করলেন এবং একাকী নিঃসম্বল অবস্থায় প্যারীতে চলে এলেন।

নিঃসম্বল, নিঃসঙ্গ তরুণী প্যারীর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের ছাত্রীরূপে যোগদান করলেন। নিজের পড়া-শোনা ছাড়া আর কোনো দিকেই দৃষ্টি দিলেননা।

এমন কি কোনো বন্ধু বা বান্ধবীর সঙ্গ-সুখের জন্যেও কোনো চেষ্টা করলেননা। কলেজ-জীবনের এই চার বৎসর কি ভয়াবহ দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁকে বাস করতে হয় তার বিবরণ এই কাহিনীর গোড়াতেই দিয়েছি। অনশনের ফলে প্রায়ই মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে যেতেন, কিন্তু কোনো দিন তা নিয়ে কারুর কাছে কোনো কান্নাই কাঁদেননি, কাউকে জানতে পর্য্যন্ত দেননি তাঁর অভাবের কথা। এই হলো দারিদ্র্যের বীরত্ব—দারিদ্র্যের আভিজাত্য। এই দারিদ্র্যেরই জয়গান গেয়ে গিয়েছেন কবিরা—মনীষিরা—ঋষিরা। এই দারিদ্র্য দেয় চরিত্রের মহিমা, আত্মার শক্তি, জীবনের গূঢ় রস-উৎসের সন্ধান।

প্যারীর সেই অন্ধকার গলির ভেতর, আলো-বাতাস-হীন গর্ত্তে সারাদিনে মাত্র একটা মুলো চিবিয়ে খেয়ে যে-তরুণীর দিন চলে যাচ্ছিলো, চল্লিশ বছর পরে সেই তরুণীর জীবনকে ছায়াচিত্রে রূপায়িত করবার জন্যে লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ করা হয়।

এইভাবে নিঃসঙ্গ একাকী উপবাস আর অনশনের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে মানিয়া (ম্যাডাম কুরী) বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ-ডিগ্রী পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। ১৮৯৩ সালে তিনি পদার্থ-বিজ্ঞানে এম্-এ ডিগ্রী পেলেন, তার পরের বছর গণিত-বিজ্ঞানে এফ-এ ডিগ্রী নিলেন। ডিগ্রী-পরীক্ষার পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের গবেষণায় রত হলেন।

মানিয়ার সঙ্গে যেসব ছাত্ররা পড়তেন, তাঁরা সবাই সেই তরুণী-প্রতিভাকে শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালোবাসতেন, অবশ্য দূর থেকে। মানিয়া-সম্পর্কে ছাত্রদের একটি মাত্র অভিযোগ ছিল, মানিয়া কারুর সঙ্গেই কথা বলেনা। বোধহয় সে সন্ন্যাসিনী হয়েই জন্মেছে।

সেইসময় সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে মানিয়ার মতনই বিচিত্র-চরিত্র নির্বাক এক বৈজ্ঞানিক—অধ্যাপকের কাজ করতেন। তখন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ, কিন্তু সেই পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে তিনি কোনো নারীর সঙ্গে আলাপ করবার অবকাশ পাননি। তাঁর নাম—পিয়ারে কুরী। অদ্ভুত প্রতিভা। ষোলো বছর বয়সে বিজ্ঞানে বি-এ ডিগ্রী পান।

এবং আঠারো বছর বয়সে পদার্থ-বিজ্ঞানে অধ্যাপনার কাজ সুরু করেন। অধ্যাপনার কাজ করতে-করতে তিনি তত্ত্ব আর যন্ত্রের দিক থেকে সেই বয়সেই কতকগুলি বিস্ময়কর আবিষ্কার করেন। প্যারীর বৈজ্ঞানিক-মহলে একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হিসাবে তখন তাঁর খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সেই খ্যাতিকে তিনি আর্থিক সুবিধায় রূপান্তরিত করতে পারেননি। সে-পন্থা তিনি জানতেননা। সেই অনন্যসাধারণ প্রতিভার বিনিময়ে তিনি রাষ্ট্রের কাছ থেকে মাত্র ছুশো টাকার মতন মাইনে পেতেন এবং তার অধিকাংশই তাঁর বই কিনতে অথবা গবেষণার জিনিসপত্র কিনতে খরচ হয়ে যেতো। খেতে-পরতে বিশেষ কিছুই থাকতোনা।

মানিয়া বৈজ্ঞানিক-গবেষণার কাজে এই অদ্ভুত লোকটির সংস্পর্শে এলেন। ক্রমশ তাঁদের পরিচয় গভীর হয়ে উঠলো। পরস্পর বুঝলেন, যেন পরস্পরের জন্যেই তাঁরা জন্মেছেন। একদিন পিয়ারে কুরী একান্ত সংকোচে মানিয়ার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করলেন, মানিয়া আনন্দে সম্মতি দিলেন।

বিবাহের দিন তাঁরা দেখলেন, তাঁদের ছু'জনের মিলিত যে অর্থ-সঙ্গতি, তাতে ক'রে কোনো হোটেলে কিম্বা কোনো দূরদেশে মধুযামিনী যাপন করা সম্ভব নয়। তাঁদের সম্বলের মধ্যে ছিল, ছু-জনার ছু'খানি সাইকেল। সেই ছু'খানি সাইকেল নিয়ে, সঙ্গে কিছু রুটি, মাখন আর কিছু ফল সংগ্রহ ক'রে তাঁরা সাইকেলে বেরিয়ে পড়লেন 'হনিমুন্' যাপন করতে। সারাদিন সাইকেলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ান, রাত্রিবেলা কোনো চাষীর প'ড়ো-ঘরে মোমের বাতির আলোয় মধু-রাত্রি যাপন করেন।

সেদিন এই ছুটি প্রতিভার মিলনে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক সম্পূর্ণ নতুন সম্ভাবনার আলো জ্বলে উঠলো।

দীর্ঘদিনের অনশন আর অর্দ্ধাহার···তার ওপর বৈজ্ঞানিক-গবেষণার দরুণ বিনিদ্র পরিশ্রম···ভেতর থেকে তরুণীর দেহকে কখন ভেঙে ফেলেছিল, সে-সংবাদ

তরুণী নিজেই জানতেননা। জানালেন ডাক্তারেরা। ম্যাডাম কুরীকে তাঁরা সতর্ক ক'রে দিলেন, অবিলম্বে যদি সব কাজ ফেলে রেখে কোনো সানাটোরিয়ামে গিয়ে বিশ্রাম না নেন, তাহ'লে যক্ষার আক্রমণ কিছুতেই রোধ করতে পারবেননা। ইতোমধ্যেই বাঁ-দিকের বুকে তার আঘাতের চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

কিন্তু বিশ্রামের অবকাশ কোথায়? তখন এক বিস্ময়কর ব্যাপার নিয়ে তাঁর সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। সম্প্রতি অধ্যাপক বেকারেল 'উইরেনিয়াম' ব'লে এক নতুন ধাতু আবিষ্কার করেছেন। সেই ধাতু নিয়ে গবেষণা করতে-করতে অধ্যাপক এক বিচিত্র ব্যাপার দেখলেন, সেই ধাতুর ভেতর থেকে একরকম আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, যে আলোকরশ্মি অস্বচ্ছ পদার্থকে ভেদ ক'রে চলে যেতে পারে। কোথা থেকে আসছে সেই রহস্যময় আলোক-রশ্মি? ম্যাডাম কুরী সেই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে তখন এমন তন্ময় হয়ে পড়লেন যে, বাঁ-দিকের বুকে 'টিবি'র জীবাণু কি করছে, তার সন্ধান নেওয়ার আর অবকাশ জুটলোনা।

মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বিচিত্র পরিশ্রমের পর ম্যাডাম কুরী সেই প্রশ্নের উত্তর পেলেন। হাজার-হাজার রাসায়নিক পদার্থের গবেষণা ক'রে তিনি সিদ্ধান্তে এলেন, সেই বিস্ময়কর আলোক-রশ্মি আসছে সম্পূর্ণ নতুন এক ধাতুর বুক থেকে, যে-ধাতুর সন্ধান আজও পয্যন্ত মানুষ জানেনা। ম্যাডাম কুরী সেই বিচিত্র ধাতুর নাম দিলেন—'রেডিয়াম্'।

সমগ্র বৈজ্ঞানিক-জগৎ প্রশ্ন ক'রে উঠলো, তাই যদি হয়, তাহ'লে সেই রেডিয়াম্ ধাতু কোথায়? আমাদের চোখের সামনে দেখাও সেই ধাতুকে?

বস্তুর রহস্য-জালের অন্তরালে, মানুষের চাক্ষুষ-দৃষ্টির বাইরে কোথায় লুকিয়ে আছে সেই রহস্যময় ধাতু, ম্যাডাম কুরী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত নিযুক্ত করলেন, তাকে খুঁজে বার করতে। তিনি কাগজে-কলমে প্রমাণ পেয়েছেন, তার চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন, সে-ধাতু যে আছে এ-বিশ্বাস তাঁর নির্ভুল, কিন্তু এমন সূক্ষ্মভাবে, এমন গুপ্তভাবে তা আছে, তার সন্ধান পাওয়াই হলো দুষ্কর

ব্যাপার। সেই অতি-সংগোপন অতি-সূক্ষ্ম এবং অতিবিরল রহস্যময় ধাতুর সন্ধানে সেদিন স্বামী-স্ত্রী দু'জনে যে দুরূহ বৈজ্ঞানিক-এ্যাড্‌ভেঞ্চারে বহির্গত হন, তার মতন রোমান্টিক, তার মতন শ্রমসাধ্য ও কঠিন সাধনা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও খুব বেশী দেখা যায়না। সেই সুদীর্ঘ ও বিরাট গবেষণার জন্যে যে অর্থ-সঙ্গতির প্রয়োজন তা তাঁদের ছিলনা, ছিলনা কোনো সহায়-সম্বল। ছিল একমাত্র তাঁদের অন্তরের নিষ্ঠা আর বিশ্বাস, আর সেই বিশ্বাসকে অনুসরণ ক'রে চলবার মতন দুঃসাহসিকতা। কারণ, সেইজাতীয় কোনো ধাতু যে থাকতে পারে, সে-সম্বন্ধে তখন বৈজ্ঞানিক-জগতে ঘোরতর সন্দেহ ছিল। বৈজ্ঞানিকদের দৃঢ় ধারণা ছিল, কুরী-দম্পতী আলেয়ার পেছনে ছুটছেন! তাই তাঁদের সেই দুঃসাহসিক অভিযানে তাঁরা কারুর কাছ থেকেই কোনো সাহায্য পাননি। জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত ভুলে অসীম দারিদ্র্যের মধ্যে সেই দু'টি একক প্রাণী দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অগ্রসর হয়ে চলেন, একটা পরীক্ষার পর আর-একটা পরীক্ষা নিয়ে। এইভাবে চার বৎসরকাল সমানে পরিশ্রম করার ফলে তাঁরা সন্দিগ্ধ-জগতের চোখের সামনে বস্তুর রহস্য-লোক থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে এলেন, মাত্র এক ডেসিগ্রাম রেডিয়াম, অর্থাৎ একটা সরষের অর্দ্ধেক যতখানি হয়, ততখানি রেডিয়াম্। কিন্তু সেই সরষে-প্রমাণ ধাতুই নিজের অস্তিত্বের বাস্তবতায় প্রমাণ ক'রে দিলো যে, বিরল হলেও, জগতে রেডিয়াম্ আছে।

এই আবিষ্কারের ফলে সমস্ত বিজ্ঞান-জগতে আলোড়ন প'ড়ে গেল। দেশ-দেশান্তরের বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাডাম কুরীকে অভিনন্দন জানালেন। যে প্রণালী অনুসরণ ক'রে ম্যাডাম কুরী পিচ-ব্লেণ্ডের ভেতর থেকে এই দুর্মূল্য রেডিয়াম্‌কে আবিষ্কার করেছিলেন, জগতে একমাত্র তিনি আর তাঁর স্বামী ছাড়া সেই প্রণালী কেউ জানতোনা। বড়-বড় ধনী ব্যবসায়ীরা কোটি-কোটি টাকা নিয়ে এসে ম্যাডাম কুরীকে আবেদন করতে লাগলেন, এই রেডিয়াম্-প্রস্তুত-প্রণালীকে পেটেণ্ট ক'রে নিতে। তখন বৈজ্ঞানিক-মহলে রেডিয়ামের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আর

কোনো সন্দেহ ছিলনা। এত স্বল্প পরিমাণ এই ধাতু আছে যে, তার মূল্য অপরিসীম। সেইজন্যে ব্যবসায়ীরা ঝুঁকে পড়লো, তার স্বত্ব অধিকার করবার জন্যে। কিন্তু সেই দরিদ্র বৈজ্ঞানিক-নারী, জগতের ধনী ব্যবসায়ীদের সেই কোটি টাকার প্রলোভন সানন্দে ও স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করলেন। বিজ্ঞানের দান কারুরই একার সম্পত্তি নয় এবং বিজ্ঞানের সত্য—ব্যবসায়ের মূলধন নয়, এই মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সেদিন ম্যাডাম কুরী তাঁর সেই বিস্ময়কর আবিষ্কারকে জগতের সকল মানুষের সম্পত্তি হিসাবে পেটেণ্ট করতে অস্বীকৃত হলেন। সেই নির্লোভ নারী স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন, মানুষের ব্যাধির সঙ্গে, মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করবার জন্যেই রেডিয়ামের আবিষ্কার হয়েছে। এ হলো প্রত্যেক মানুষের প্রয়োজনের জিনিস। এ নিয়ে ব্যবসা করা চলেনা।

একগ্রাম রেডিয়ামের দাম হলো—সাড়ে-চার লক্ষ টাকা! বৈজ্ঞানিক-কুরীর চেয়েও মানবতার ইতিহাসে বড় হয়ে আছে—মানবী ম্যাডাম কুরী।

এইজাতীয় বৈজ্ঞানিকদের দরুণই বিজ্ঞান পেয়েছে তার আত্মা, অমরত্ব ও অমৃতত্ব।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে একশ্রেণীর লোককে আমরা ঋষি ব'লে পূজা করতাম। ঋষিরা মানুষের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করতেন। মানুষের কল্যাণে সাধনা করতেন। সাধনায় জয়যুক্ত হ'লে তার জন্যে কোনো আর্থিক মূল্য দাবী করতেননা, কোনো কৃতজ্ঞতা ভিক্ষা করতেননা। কোনো যশ, কোনো প্রশংসায় বিচলিত হতেননা। তাঁরা ছিলেন—স্বপ্ন-দ্রষ্টা। শুধু মানুষের কল্যাণের স্বপ্ন ছিল তাঁদের কাছে, আর কিছুই বাস্তব ছিলনা। ভারতবর্ষ চিরদিন এই ঋষিদের নিঃস্বার্থ দানে সমৃদ্ধ হয়ে এসেছে—এই ঋষিদের শ্রেষ্ঠ পুরুষ ব'লে শ্রদ্ধা ক'রে এসেছে।

আজও ভারতবর্ষে এই ঋষিদের দেখা যায়। তবে তাঁদের সংখ্যা কমে এসেছে, এবং যাঁরা আছেন, তাঁদের সামাজিক মূল্যও আজ হ্রাস পেয়ে এসেছে। আজ হলো বণিকের যুগ, অর্থ হলো সমাজের মানদণ্ড, বিজ্ঞান হলো প্রতিষ্ঠার ভিত্তি।

পাশ্চাত্ত্য-জগতেও এই ঋষিদের দেখা যায়। পশ্চিমের এই অর্থকরী প্রচার-সর্ব্বস্ব ব্যবসায়িক-সভ্যতায় তাঁরা হলেন ব্যতিক্রম। মানবতার সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মী নির্ব্বাসিতা হয়ে এই ঋষিদের তাঁর জীবন-মন্দিরে নিয়েছেন।

কুরী-দম্পতী হলেন এইজাতীয় ঋষি।

এত কৃতিত্ব, এত সাধনা সত্ত্বেও কুরী-দম্পতী একটা ভালো ল্যাবরেটরী নিজেদের ব্যবহারের জন্যে পেলেননা। যে দেবতাদের সন্তুষ্ট করলে যশের সঙ্গে অর্থ পাওয়া যায়, পাওয়া যায় সামাজিক প্রতিপত্তি, কুরী-দম্পতী সে-দেবতাদের চিনতেননা। কি ক'রে নিজেদের ঢাক নিজেরাই বাজাতে হয়, তা তাঁরা জানতেননা। সে-প্রথাকে তাঁরা অন্তর থেকে ঘৃণা করতেন। কিন্তু আজকের যে সমাজ-ব্যবস্থা, তাতে শুধু কৃতিত্বই বেশী দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেনা. তার সঙ্গে চাই স্তাবকতা, চাই রাষ্ট্র-পরিচালকদের খোসামোদ।

ফ্রান্সের শিক্ষামন্ত্রী পিয়ারে কুরীর কলেজের অধ্যক্ষকে জানালেন, যদি পিয়ারে কুরী আবেদন করেন, তাহ'লে তাঁরা তাঁকে 'গিজন অফ অনার' উপাধি দিতে পারেন।

অধ্যক্ষ আনন্দে সে-কথা কুরী-দম্পতীকে জানালেন। কুরী-দম্পতী তার উত্তরে জানালেন, আমাদের কোনো উপাধির, বা পদকের প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রয়োজন শুধু একটা ভালো ল্যাবরেটরীর। তাই পেলেই আমরা সন্তুষ্ট হবো।

অধ্যক্ষ বহু চেষ্টা করেও কুরী-দম্পতীকে রাজী করাতে পারলেননা। এ কি অদ্ভুত লোক···সম্মানের কাছ থেকে ছুটে পালায়!

অবশেষে অধ্যক্ষ পরামর্শ দিলেন, পিয়ারে কুরী যদি ফ্রান্সের এ্যাকাডেমীর সভ্য হতে পারেন, তাহ'লে তিনি যা চাচ্ছেন তা অনায়াসেই পেয়ে যাবেন। এ্যাকাডেমীর সভ্য হতে হ'লে, নির্ব্বাচনে দাঁড়াতে হবে। এবং প্রত্যেক সদস্যের বাড়ী গিয়ে-গিয়ে নিজের কৃতিত্বের কথা জানিয়ে তাঁদের ভোট সংগ্রহ করতে হবে। পিয়ারে কুরী ভীত হয়ে উঠলেন। তিনি কি ক'রে লোকের দরজায়-দরজায় গিয়ে নিজের কথা নিজের মুখে বলবেন? এই কি বৈজ্ঞানিকের কাজ?

শেষে বন্ধু-বান্ধবদের বহু অনুরোধে পিয়ারে কুরী এ্যাকাডেমীর নির্ব্বাচনে প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন, আর-একজন বৈজ্ঞানিক—মেঁাসিয়ে আমাগা।

নির্ব্বাচনের আগে ভোট সংগ্রহের জন্যে পিয়ারে কুরীকে সদস্যদের বাড়ীতে-বাড়ীতে যেতে হলো। সেখানে সদস্যদের সঙ্গে আলাপে তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আমাগার কথাই বলতে লাগলেন···আমাগার প্রশংসা করতে লাগলেন···নিজে যে কি করেছেন সে-কথা আর বলতে পারলেননা।

সদস্যরা সকলেই আমাগাকে ভোট দিলেন!

য়ুরোপের বড়-বড় সংবাদপত্রের অফিস থেকে প্রতিনিধিরা আসে, ম্যাডাম কুরীর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের রোমাঞ্চকর বিবরণ আহরণ করতে। কিন্তু ম্যাডাম কুরী সযত্নে তাঁদের এড়িয়ে চলেন।

একবার সাগরের ধারে একটা ছোট্ট গ্রামে ক'দিনের জন্যে বিশ্রাম করতে গিয়েছেন। আমেরিকার এক বড় কাগজের রিপোর্টার সন্ধান পেয়ে সেখানে উপস্থিত হলো।···খুঁজতে-খুঁজতে শেষে একটা সামান্য কুঁড়েঘরের সামনে এসে উপস্থিত হলো। সেই কুঁড়েঘরেই নাকি ম্যাডাম কুরী থাকেন।

কুঁড়ের দরজায় একটা কাঠের চৌকিতে ব'সে অতি সাধারণ চাষী-রমণীর পোষাকে একজন মহিলা ব'সে আছেন···আপনার মনে পশম বুনছেন।

রিপোর্টার এসে জিজ্ঞাসা করে—বলতে পারো, তোমার মনিবানী ম্যাডাম কুরী ঘরে আছেন কিনা?

মহিলা শান্তকণ্ঠে উত্তর দেন—না। তিনি ঘরে নেই।

রিপোর্টার জিজ্ঞাসা করে—কখন ফিরবেন বলতে পারো?

মহিলা তেমনি শান্তকণ্ঠে বলেন—তা তো জানিনা!

রিপোর্টার বলে—তাঁর সম্বন্ধে দু'একটা চমকপ্রদ খবর আমাকে বলতে পারো?

মহিলা বলেন—তাঁর জীবনের তেমন কোনো চমকপ্রদ ঘটনাই আমার জানা নেই। তবে তিনি আমাকে ব'লে দিয়েছেন, যদি কোনো খবরের কাগজের রিপোর্টার

এসে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তাহ'লে তাঁকে শুধু এই কথাটাই বলতে, লোকের জীবন সম্বন্ধে এতখানি কৌতূহলী না হয়ে, তাদের কৌতূহলী হওয়া উচিত—জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে!

—বলতে পারো···ম্যাডাম কুরী ঘরে আছেন কিনা ?—

হতাশ হয়ে ফিরে যায় রিপোর্টার। হেসে উঠলেন ম্যাডাম কুরী।

অবশেষে একদিন বন্ধু-বান্ধবদের চেষ্টার ফলে পিয়ারে কুরী—বৈজ্ঞানিকদের স্বর্গধাম এ্যাকাডেমীতে প্রবেশ করতে পারলেন এবং তার ফলে সোর্বণের অধ্যাপকও হলেন, এবং এতদিন পরে তাঁর জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষার ধন, একটি ভালো ল্যাবরেটরী পেলেন।

সেই নতুন ল্যাবরেটরীতে পিয়ারে কুরী নতুন গবেষণায় নিজেকে ডুবিয়ে দেন। একদিন বিকেলবেলায় বৃষ্টি পড়ছে, তিনি বাড়ী থেকে ল্যাবরেটরীর দিকে বেরুলেন। কিছুক্ষণ পরে ম্যাডাম কুরী দেখেন, তাঁর মৃতদেহ বহন ক'রে আনলো পথের লোকেরা। হঠাৎ পা পিছলে তিনি রাস্তায় প'ড়ে যান, সেই অবস্থায় একটা দ্রুতগামী 'লরী' তাঁর দেহের উপর দিয়ে চলে যায়।

ম্যাডাম কুরী পাথরের মূর্ত্তির মতন স্বামীর মৃতদেহকে গ্রহণ করলেন। তারপর কৃষ্ণ-বসনে স্বামীর পরিত্যক্ত ল্যাবরেটরীতে স্বামীর অসমাপ্ত গবেষণাকে সম্পূর্ণ করবার জন্যে আত্মনিয়োগ করলেন। সারাদিন ল্যাবরেটরীতে কাজ ক'রে আসার পর, রাত্রিতে বাড়ীতে—চারদিক যখন নিশুতি হয়ে আসতো তখন তিনি কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসতেন· চিঠি লিখতেন পিয়ারে কুরীকে···যেন তিনি বিদেশে বেড়াতে গিয়েছেন, তাই প্রেমময়ী স্ত্রী প্রতিদিনের সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে স্বামীকে লিখে জানাচ্ছেন।···প্রতিদিন রাত্রিতে সকল কর্ম্মের অবসানে তিনি ফিরে আসতেন তাঁর স্বপ্নলোকে, যেখানে বিরাজ করতো শুধু দুটি প্রাণী, তিনি আর তাঁর প্রাণের প্রাণ—পিয়ারে। "পিয়ারে আমার! আমি জানি, শুনে তুমি সুখী হবে, তোমার পরিত্যক্ত আসনে কাজ করবার ভার তাঁরা আমাকে দিয়েছেন। ওগো বন্ধু, ঠিক সেইখানে বসেই আমি তোমার অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করছি। পিয়ারে আমার! আমার চারদিকে অন্ধকারে আজ ফুটেছে রাতের ফুলেরা—আইরিস, হথর্ণ, উইস তারিয়াতে ভ'রে গিয়েছে বাগান···বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে তাদের সুগন্ধে। এই গন্ধ ছিল তোমার প্রিয়, তাই আজ এই সুগন্ধে তুমিই রয়েছো আমার চারদিকে। ওগো বন্ধু, আর ভালো লাগেনা এই সূর্য্যের আলো,

ভালো লাগেনা এই ফুলের মেলা। ভালো লাগে আমার সেই সূর্য্যহীন অন্ধকার দিন, যেমন দিনে তুমি চলে গিয়েছিলে আমার কাছ থেকে। তবে আজও যে আমি সূর্য্যকে চাই, ফুলগন্ধী বাতাসকে চাই, সে আমার জন্যে নয়, তোমার-আমার ছেলেদের জন্যে···তারা যেন এই সূর্য্যের আলো, এই ফুলগন্ধী বাতাসে পূর্ণ হয়ে ওঠে···"

এমনি প্রতি রাত্রিতে বিশ্ববিহীন নির্জনতায় একজন নারী সারাদিনের কঠোর বৈজ্ঞানিক-পরিশ্রমের পর, নিজেকে নিয়ে যেতো স্বপ্নের দেশে, প্রেমের দেশে, চির-মিলনের দেশে!

যেদিন ম্যাডাম কুরীকে এ্যাকাডেমীর সদস্যরূপে গ্রহণ করবার প্রস্তাব হয়, সেদিন সুসভ্য ফরাসী রাষ্ট্র-নায়কগণ ঘোরতর আপত্তি তুলেছিলেন, আপত্তির কারণ, কোনো নারীকে আজপর্য্যন্ত এই অধিকাব দেওয়া হয়নি—নাবীর সেখানে প্রবেশ নিষেধ। নারী-স্বাধীনতার দেশ য়ুরোপ, এবং সেই য়ুরোপের মধ্যে সবচেয়ে সুসভ্য জাতি হলো ফরাসীরা, অথচ বিংশ শতাব্দীতে সেই সুসভ্য ফরাসীদের শিক্ষিত সমাজেও ছিল নারী সম্বন্ধে এই কুসংস্কার!

যতদিন জীবিত ছিলেন এই বৈজ্ঞানিক-নারী, মানবতার কল্যাণে অতন্দ্র ভাবে নিজের নির্দ্দিষ্ট পথে সাধনা ক'রে গিয়েছেন। রেডিয়াম কিভাবে মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে, রোগযন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে, তারই জন্যে ম্যাডাম কুরী জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত সেই রহস্যময় আলোক-শক্তিকে নিয়ে গবেষণা ক'রে গিয়েছেন।

বৃদ্ধ বয়সে একদিন আর তিনি পারলেননা, বাধ্য হয়ে শয্যা নিলেন। সারা দেহের ভিতর অসহ্য যন্ত্রণা! বড়-বড় ডাক্তারেরা এসে বহু ভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন। কিন্তু কি যে রোগ তা ধরতে পারলেননা। সেই রোগেই ম্যাডাম কুরী দেহত্যাগ করলেন।

তাঁর দেহত্যাগের পর জানা গেল, বহুদিন ধ'রে তিল-তিল ক'রে রেডিয়ামের সেই তীব্র আলোক-রশ্মিই তাঁর দেহের ভেতর গভীর সব ক্ষত-কেন্দ্র তৈরী

করেছিল। নীলকণ্ঠের মতন সে-বিষকে তিনি ধারণ করেছিলেন ব'লেই আজ জগতের চিকিৎসা-বিজ্ঞানে রেডিয়াম মুক্তি-দূতের রূপে আবির্ভূত হয়েছে।

য়ুরোপবাসিনী হে তপস্বিনী, তোমাকে প্রণাম! মৃত্যু-পঙ্কিল য়ুরোপের স্বর্ণ-কর্দ্দমে তুমি ফুটে আছো স্বপ্ন-সুষমাময় শ্বেত শতদল! আজকের এই ব্যবসায়ী বাস্তবতার জগতে তোমার আশ্বাসবাণী—বহু বেদনায় আজও যারা রয়েছে স্বপ্ন-পথের পসারী হয়ে, তারা ভুলবে না, "Dreamers do not deserve wealth because they do not desire it!"

যিনি পারেন, জীবনে অনূদিত করুন এই উক্তিকে।

— — —

বার্নার্ড পালিসীর তপস্যা

বার্নার্ড পালিসীব নাম তোমরা বোধহয় শুনে থাকবে। মাটিব উপর এনামেলের কাজ করার বিদ্যা তিনি ফ্রান্সে প্রগম আবিষ্কার করেন। আজকে তাঁর জীবনের কাহিনী তোমাদের শোনাবো।

এখানে তোমাদের দু'একটা কথা আগে থেকে ব'লে রাখতে চাই। বার্নার্ড পালিসী একজন খুব বড় বৈজ্ঞানিক নন, এমন কি, তাঁকে আবিষ্কর্ত্তাও বলা চলেনা! তাঁর কারণ, তাঁর বহু পূর্ব্বে এনামেল করার বিদ্যা বহু মানুষ আয়ত্ত করেছিলেন এবং তিনি যে-সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে-সময় য়ুরোপে, ইটালী এবং জার্ম্মানীতে এই বিদ্যা প্রচলিত ছিল। কিন্তু তখন যাঁরা এই কাজ করতেন

তাঁরা কাউকেই এই বিদ্যা শেখাতেননা। এমন কি, নিজেদের মধ্যেও যতদূর সম্ভব, কে কিভাবে কাজ করে, কে কি জিনিস ব্যবহার করে তা গোপন রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করতেন তাঁরা। পালিসী নিজে চেষ্টা ক'রে এই বিদ্যা শিখেছিলেন। কিন্তু সেজন্যে পালিসীর জীবন আলোচনা করছিনা—এবং জগতের শ্রেষ্ঠ লোকদের মধ্যে আজও যে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়, তার কারণ এ নয় যে, তিনি ফ্রান্সে সর্ব্বপ্রথম এনামেলের কাজ শিখেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে তিনি যেভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সারাজীবনব্যাপী পর্ব্বত প্রমাণ বাধার বিরুদ্ধে যেভাবে সংগ্রাম ক'রে জয়ী হয়েছিলেন, সেই অপূর্ব্ব আত্মনিয়োগ, সেই জীবন-মরণ পণ সাধনা, সকল রকম বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে সেই মানুষের মতন সংগ্রাম করবার শক্তি তাঁর নামকে জগৎ-বরেণ্য ক'রে রেখেছে। তাঁর জীবন আলোচনায় মনে হয়, কোনো নৈরাশ্যই নৈরাশ্য নয়—পথ অতিক্রম ক'রে যাবার পণ সত্যিই যে গ্রহণ করেছে, তার কাছে পথের কোনো বাধাই বাধা নয়—যে বলতে পেরেছে, অন্ধকারকে বিশ্বাস করিনা, সেই পেরেছে শশী-সূর্য্য-হীন অন্ধকারে সহস্র দীপ জ্বালিয়ে যেতে। যে চলে, তারই পায়ের তলায় জেগে ওঠে পথ। বার্নার্ড পালিসীর জীবন সেই পায়ের-তলায় পথকে জাগিয়ে যাবারই অপূর্ব্ব কাহিনী।

কোন্ সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার সঠিক তারিখ জানবার আজ আর কোনো উপায় নেই। তবে অনুমান, ১৫০৯ কিংবা ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত পেরিগোরং প্রদেশে পালিসী জন্মগ্রহণ করেন। এই পেরিগোরংয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য একটু বিচিত্র ধরনের। একদিকে নিত্য-শ্যামল কাননভূমি, অন্যদিকে শস্যহীন তৃণহীন রুক্ষ দীর্ঘ উদাস প্রান্তর—পালিসীর জীবনের দুইদিকের যেন দু'খানি চিত্র।

তাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা একদিন যথেষ্ট ঐশ্বর্য্য এবং সম্ভ্রমের মধ্যে জীবন-যাপন ক'রে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁদের বংশমর্য্যাদা কতক পরিমাণে অক্ষুণ্ণ থাকলেও, সেই মর্য্যাদা-বোধকে বাঁচিয়ে রাখবার মতন ঐশ্বর্য্য

তখন আর ছিলনা। অল্প টাকায় যাদের অনেকখানি সম্ভ্রম বজায় রেখে চলতে হয়, তাদের নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই সাধারণ লোকে যেভাবে অর্থোপার্জ্জন করতে পারে, পালিসী তা থেকে একটু স্বতন্ত্র হয়ে অর্থোপার্জ্জনের পন্থা আবিষ্কার করলেন। সেইসময় ফ্রান্সের ধনী লোকদের মধ্যে কাচের উপর রঙিন ছবি আঁকাবার খুব সখ ছিল। পালিসী সেই কাজই শিখলেন। ছেলেবেলা থেকে ছবি আঁকার দিকে তাঁর একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। অর্থোপার্জ্জনের জন্যে তাই তিনি স্থির করলেন যে, কাচের উপর ছবি এঁকেই তিনি জীবিকা-নির্ব্বাহ করবেন।

কিন্তু ঘরে ব'সে এ-কাজ করা তখনকার দিনে চলতোনা। খুব বড়লোক না হ'লে এই ধরনের কাজ কেউ একটা বড় করাতেননা। সেইজন্যে সারা দেশ ঘুরে বেড়াতে হতো—কোথায় কোন্ প্রদেশে কোন্ ধনীর ছবি আঁকবার বাসনা আছে কে বলতে পারে? ঘুরে বেড়াতে পালিসীর কোনো অনিচ্ছাও ছিলনা। ঘুরে বেড়াতে তাঁর ভালো লাগতো—নিত্য নতুন পথে, নিত্য নতুন দেশে। পথের ধারে প্রত্যেক তৃণ, ফুলটি—গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রত্যেক প্রাণীটি তাঁর পরিচিত ছিল। তিনি প্রকৃতিকে ভালোবাসতেন—প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক রূপের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে রীতিমত ব্যাকুলতা অনুভব করতেন। এতখানি মন দিয়ে যাকে চাওয়া যায়, তাকে পাওয়াও যায়। পালিসী প্রকৃতিকে জানতে চেয়েছিলেন। ফ্রান্সের প্রকৃতি তাই তার সমস্ত রহস্য সেদিন এই লোকটির সামনে আপনা থেকে যেন উদ্ঘাটিত ক'রে দিয়েছিল। পালিসী যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনি ছিলেন ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় প্রকৃতি-তত্ত্বজ্ঞ। গাছ-পালা, ফল-ফুল, পশু-পক্ষী সম্বন্ধে তাঁর কথা শোনবার জন্যে একসময়ে ফ্রান্সের বড়-বড় বৈজ্ঞানিকেরা তাঁর দ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই বিদ্যা তিনি বই প'ড়ে অর্জ্জন করেননি। যাদের কথা তিনি বলতেন, সেইসব গাছ-পালা, ফল-ফুল, পশু-পক্ষী—তারাই তাঁকে শিখিয়েছিল তাদের সম্বন্ধে কি বলতে হবে।

আঠারো বছর বয়সে পালিসী ঘর ছেড়ে কাজেব সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। কোথাও কোনো গির্জ্জের জানলায়, কোথাও কোনো ধনীর বিলাস-কক্ষে, যখন যেখানে কাজ যোগাড় করতে পারেন, সেইখানে পথ চলতে-চলতে থেমে পড়েন.? সেখানকার কাজ শেষ হ'লে আবাব অন্যজায়গায় চলে যেতে হয়। কিছুদিন এইভাবে একরকম চলে যাওয়ার পর দেখা গেল যে, কাজ পাওয়া ক্রমশই দুরূহ হয়ে উঠছে। পঞ্চাশ মাইল গিয়ে যখন শোনা যায় যে, সেখানে কোনো কাজ পাওয়া যাবেনা—তখন সেই পঞ্চাশ মাইল হাঁটবার কষ্টটা আরও বেশী ক'রে লাগে।

প্রায় বারো বৎসর এইভাবে কেটে গেল। এই বারো বৎসর শুধু উদরান্ন সংস্থানের জন্যেই অতিবাহিত হয়নি। এই বারো বৎসরকাল তিনি তন্ন-তন্ন ক'রে প্রকৃতির অনুশীলন করেছেন—দেখেছেন, নীরবে প্রকৃতির মধ্যে অহরহ কি বিরাট সব ব্যাপার ঘটে চলেছে। একটি ফুলকে ফোটাবার জন্যে সমস্ত অরণ্যব্যাপী সে কি বিরাট আয়োজন! একটি তৃণাঙ্কুরকে রক্ষা করবার জন্যে অরণ্যের সে কি আকুলতা! যে দেখতে জানে সেই দেখতে পায়, এমনিধারা আমাদের চারদিকে মূক প্রকৃতির রাজ্যে কত ধৈর্য্য, কত প্রেম, কত ত্যাগ, কত অশ্রু—শিশির-বর্ষণ-অন্তে কত সূর্য্য-কিরণ-উন্মাদনা অহরহ সংঘটিত হচ্ছে। প্রকৃতির প্রত্যেক শ্যাম-পত্রে লেখা—ভয় নাই, ক্ষয় নাই!

পালিসী বারো বৎসর ধ'রে সেই লেখা পড়েছিলেন। যে-বাণী অরণ্য তার শ্যাম-পত্রে লিখে রেখেছে, তারই প্রতিধ্বনি তাঁর ধমনীতে বেজে উঠতো— ভয় নাই, ক্ষয় নাই!

বারো বৎসর পরে তিনি স্থির করলেন যে, আর ঘুরে বেড়ানো নয়, এবার একজায়গায় স্থির হয়ে বসতে হবে। 'স্যাঁতে' ব'লে একটি ছোট্ট সহরে একখানি ছোট্ট বাড়ী ক'রে তিনি বসবাস স্থাপন করলেন।

যাযাবর হলো গৃহবাসী। যথারীতি বিবাহ ক'রে গৃহলক্ষ্মীকে ঘরে নিয়ে এলেন। পালিসী সেদিন কল্পনাও করতে পারতেননা যে, যে-বাড়ী তিনি গ'ড়ে তুললেন, তারই কাঠ ভেঙে একদিন আগুনে পোড়াতে হবে,— যে-নারী সেদিন সানন্দে বধূ-রূপে তাঁর ঘরে এলেন, তিনিও সেদিন কল্পনা করতে পারতেননা যে, কি ভয়াবহ দুর্দ্দৈবের সঙ্গে তাঁর জীবন সেদিন সংযুক্ত হয়ে গেল! পালিসীর একজন জীবন-চরিত লেখক বলেছেন, বিয়ের দিন যদি পালিসীর স্ত্রী তাঁর ভবিষ্যৎ সাংসারিক-জীবনের ছবি কোনোরকমে একবার দেখতে পেতেন, তাহ'লে তিনি নিশ্চয়ই গির্জ্জে থেকে ছুটে পালাতেন!

স্যাঁতেতে কয়েক বছর থাকার পর, পালিসী দেখলেন যে, কাজ-কর্ম্ম পাবার আর কোনো উপায় নেই। এধারে সংসারে তাঁর দু'জন স্থায়ী আগন্তুক এসেছে। নিত্য সংসারে অনটন দেখা দিতে লাগলো। পালিসী স্থির করলেন, যে, অন্য কোনো উপায় অবলম্বন ক'রে উপার্জ্জন বাড়াতে হবে, শুধু ছবি-আঁকার উপর নির্ভর ক'রে থাকলে, অনশনে মরতে হবে।

এইসময় হঠাৎ কোথা থেকে এনামেল-করা একটা মাটির পাত্র তাঁর হাতে এলো। মাটির উপর সেই এনামেলের কাজ দেখে পালিসী চমৎকৃত হয়ে গেলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে হলো—আমি চিত্রকর। ভগবান আমাকে কিছু ক্ষমতাও দিয়েছেন। নাই-বা জানলুম মাটির কাজ! কি ক'রে এনামেল তৈরী করে আমাকে জানতেই হবে। এই সম্বন্ধে তিনি নিজে লিখে গিয়েছেন, "অন্ধকারে লোকে যেমন পথ হাতড়ে বেড়ায়, তেমনিধারা আমিও এনামেল কি ক'রে তৈরী করা যেতে পারে তাই খুঁজে বেড়াতে লাগলাম।"

এখানে মনে রাখতে হবে যে, যে-সময়ের কথা আমরা বলছি, সে-সময় য়ুরোপে প্রকৃতপক্ষে রসায়ন-বিজ্ঞান জন্মগ্রহণ করেনি। তখন যে-দেশে যে লোক যা-কিছু জানতো, প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে তা সংগোপনে রাখতো। জার্ম্মানী এবং ইতালির জনকয়েক কারিকর ছাড়া য়ুরোপে তখন কেউ এনামেলের কাজ জানতোনা।

তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের-নিজের বিদ্যাকে অত্যন্ত সংগোপনে রাখতেন। রাজা-. যাঁদের এনামেল করাবার সখ হতো, তাঁদের সেই কয়েকজনেরই মধ্যে একজনের দ্বারস্থ হতে হতো।

পালিসী স্থির করলেন, যে, যেমন করেই হোক্, এনামেল তৈরী করার পদ্ধতি তিনি বার করবেনই। একবার তার সন্ধান পেলে তাঁকে আর পায় কে? এনামেলের উপর এমন অপূর্ব্ব সব কাজ তিনি করবেন, যাতে জগৎ বিস্মিত হয়ে যাবে; য়ুরোপের রাজাদের প্রাসাদে-প্রাসাদে তাঁর কীর্ত্তি অক্ষয় সৌন্দর্য্য নিয়ে বেঁচে থাকবে।

সমস্ত কাজ ফেলে রেখে পালিসী এনামেল তৈরী করবার দিকে মনোনিবেশ করলেন। যতরকমের জিনিসের সংমিশ্রণে এমন পদার্থ পাওয়া যেতে পারে, যা পোড়ালে শক্ত, সাদা আর ঝক্-ঝকে হয়ে উঠবে, তাঁর ধারণা-মতন তাই সংগ্রহ ক'রে ভিন্ন-ভিন্ন মাত্রায় ভিন্ন-ভিন্ন কড়াতে আগুনেব আঁচে চড়ালেন। রাশীকৃত মাটির পাত্র কিনে নিয়ে এলেন। সেইগুলো ভেঙে-ভেঙে একজায়গায় জড়ো করা হলো। যতরকম মশলা তৈরী হয়, তার প্রত্যেকটা দিয়ে পরীক্ষা চলতে লাগলো। পালিসীর নিজের কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে, "এ একেবারে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ানো!"

ছিলেন চিত্রকর, সমস্ত যৌবন আপনাব খেয়ালে ঘুবে বেড়িয়েছেন পথ হতে পথে, হঠাৎ তিনি হলেন বৈজ্ঞানিক, যে বৈজ্ঞানিককে নিজে অনুশীলন ক'রে তথ্য আবিষ্কার করতে হবে। প্রকৃতির রূপ দেখে যে বেড়িয়েছিল, তার মনের গঠন ছিল একরকম। কিন্তু ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন দ্রব্যের অসংখ্য দ্রব-মূর্ত্তির মধ্যে যাকে আসল বস্তুটি বেছে নিতে হবে—তার সে মানসিক-গঠন থাকলে চলেনা। একবার একটু ভুল হয়ে যাওয়া মানে, আবার সমস্ত জিনিস গোড়া থেকে আরম্ভ করা। অতি সামান্য-সামান্য ব্যাপারে প্রথম-প্রথম এমন সব ভুল হতে লাগলো, যা সংশোধন করতে তাঁকে আবার নতুন ক'রে সেইসব পরিশ্রমই করতে হয়েছে। শুধু পরিশ্রম

একবারের ভুল শোধরাতে দু'বারের মতন খরচ হয়ে গেল, অথচ পরীক্ষার পর দেখা গেল যে, তাতেও কোনো সুফল পাওয়া যায়নি।

এ-সম্বন্ধে তিনি নিজে লিখেছেন, "প্রথম-প্রথম কি ভুলই না করতাম! মশলা তৈরী হ'লে, বিভিন্ন কড়া থেকে নিয়ে, বিভিন্ন পাত্রে লাগিয়ে, আগুনে পোড়াতে দিতাম। কিন্তু তখন কোনোরকম বন্দোবস্ত ক'রে পাত্রগুলো আগুনে দেবার কথা মনেই আসতোনা। কোন্ কড়া থেকে কোন্ মশলা কোন্ পাত্রে দিয়েছি, নিজেরই মনে নেই। সব ফেলে দি' আবার নতুন ক'রে করি। সারাদিন উনুনের পর উনুন ভাঙছি আর গড়ছি—সারাদিন এটা গুঁড়োচ্ছি, ওটা গুঁড়োচ্ছি, এটার সঙ্গে ওটা মিশিয়ে গরম ক'রে গলিয়ে দেখছি, এমনি ক'রে কখন দেখি একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছি।"

প্রথম-প্রথম তাঁর স্ত্রী ভেবেছিলেন যে, পালিসী শীগগিরই হয়তো এমন একটা কিছু তৈরী ক'রে ফেলবেন, যার দ্বারা তাঁদের সমস্ত অভাব-অনটন দূর হয়ে যাবে। তাই তিনি স্বামীর কথায় ধৈর্য্য ধ'রে সেই দরিদ্র অবস্থার মধ্যে পুত্রকন্যাদের আহার থেকে বঞ্চিত ক'রে, আগুনে পোড়াবার কাঠ কিনতে দেখে বিশেষ কষ্ট বোধ করেননি। কিন্তু এক মাস গেল···এক বছর গেল·· দেখতে-দেখতে বছরের পর বছর চলে যেতে লাগলো, এ কোন্ উন্মাদ! দিনের পর দিন, বিরাম নেই, বিচ্ছেদ নেই, সেই উনুনের পর উনুন জ্বেলে জিনিসের পর জিনিস মিশিয়ে চলেছে! ছেলেদের দু'বেলা পেট পুরে খাবার জোটেনা, অথচ মা'র মন কি ক'রে সহ্য করে, আগুনে পোড়াবার জন্যে কাঠ কেনা হচ্ছে!

ক্রমশ কাঠ কেনবার সামর্থ্য একেবারে চলে গেল। দু'মাইল দূরে একটা কুমোর-বাড়ী আছে। যৎসামান্য কিছু দিলে তারা তাদের উনুন ব্যবহার করতে দিতে পারে। জিনিসপত্র যা ছিল, একে-একে বন্ধক দিতে লাগলেন পালিসী। একসঙ্গে তিনশো, চারশো পাত্র তৈরী ক'রে কুমোর-বাড়ীতে পাঠাতে লাগলেন। এক-একবার ক'রে বোঝা পাঠান, আর সারারাত জেগে ব'সে থাকেন, ভাবেন, কালই হয়তো দেখতে পাবো, একটা পাত্রের গায়ে এনামেল লেগেছে—শাদা, শক্ত,

চক্‌চকে! আশায়-আশঙ্কায় সারারাত বুক কাঁপতে থাকে। রাত্রে পালিসী ঘুমোতে পারেননা। কিন্তু সকালে গিয়ে দেখেন, যা প্রত্যহ দেখছেন, আজও তাই। কোথায় এনামেলের সে রূপ!

এধারে সংসারের অবস্থা এরকম শোচনীয় হয়ে উঠলো যে, পালিসী বাধ্য হয়ে কিছুদিনের মতন এনামেল তৈরী করা ছেড়ে দিয়ে আবার ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন। হাতে যৎসামান্য পয়সা যেই এলো, অমনি আবার শুরু হলো সেই উনুন তৈরী করা আর কাঠের আঁচে সারা দিন-রাত ফুটন্ত কড়ার দিকে চেয়ে থাকা।

পালিসীর ধারণা হয়েছিল যে, যতখানি উত্তাপের প্রয়োজন, তার উনুনে ততখানি উত্তাপ তৈরী করতে তিনি পারেননি। আবার নতুন ক'রে সব মশলা কেনা হলো। যেখান থেকে শেষ করা হয়েছিল আবার সেখান থেকে আরম্ভ করা হলো। তিন ডজন মাটির পাত্র কিনে টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে ভেঙে আবার তাতে বিভিন্ন-বিভিন্ন ভাবে তৈরী মশলা মাখানো হলো। এবার কিন্তু তিনি নিজে সেগুলো পোড়াবার চেষ্টা না ক'রে, এক কাচ-ওয়ালার সঙ্গে ব্যবস্থা করলেন। কাচ-ওয়ালাদের উনুনের আঁচ খুব বেশী—সেইজন্যে সেইখানেই বন্দোবস্ত করলেন।

আবার সেই উৎসুক-আশঙ্কায় অপেক্ষা ক'রে থাকা—আবার সেই তন্দ্রাহীন-রজনী জেগে শুধু ভাবা, মাটির গায়ে সেই শক্ত-সাদা-চক্‌চকে জিনিসটা এবার বোধহয় ধরা দিয়েছে—

এবার যখন ভাঙা পাত্রগুলো ফিরে এলো, দেখেন, দু'একটার গায়ে একটু-একটু শক্ত মতন কি যেন লেগেছে! সেইটুকুতেই পালিসী আনন্দ-উৎফুল্ল হয়ে স্ত্রীকে জানালেন, আর ভয় নেই, এবার বুঝি দুর্দ্দিন কেটে গেল।

এরই মধ্যে দু'টি ছেলে মারা গিয়েছিল—অসুখে উপযুক্ত পথ্যও পায়নি! পালিসীর স্ত্রী মুখ বুঁজে সমস্ত সহ্য ক'রে চলেছিলেন। স্বামীর উল্লাস দেখে তিনি আরও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, তাঁর মনে হলো এ তাঁর উন্মাদ হবার সূচনা!

হলোও তাই। পালিসী আর বাড়ী থাকেননা। সেই কাচ-ওয়ালার উনুনের

ধারেই ঘুরে বেড়ান। এইরকম ভাবে আরও এক বছর কেটে গেল। এক বছর ধ'রে আবার দিনের পর দিন সেই পরীক্ষা চললো। কিন্তু তবুও কিছু হলোনা। অসহায় স্ত্রী—পুত্র-কন্যা নিয়ে তখন কান্না-কাটি আরম্ভ করেছেন; ঘরে এক-কণা খাদ্য নেই, এধারে একি উন্মাদনা।

— স্ত্রীকে দেখালেন, আর ভয় নেই -

স্ত্রীকে অনেক বুঝিয়ে তিনি বললেন, এই শেষবার। কোনো রকমে কিছু টাকা ধার ক'রে, তিনশো রকমের বিভিন্ন মশলা তৈরী ক'রে তিনি কাচ-ওয়ালার কারখানায় উপস্থিত হলেন। পর্য্যায়ক্রমে সেই তিনশো পাত্র আঁচে দিয়ে একদৃষ্টিতে আগুনের দিকে চেয়ে রইলেন। আহার-নিদ্রা সমস্তই ত্যাগ করলেন।

একটার পর একটা পাত্র আগুন থেকে তোলেন, ঠাণ্ডা করেন, দেখেন, মশলা গ'লে গায়ে লেগেছে কিনা। হঠাৎ একটাতে দেখলেন, মশলা পুরোপুরি গ'লে গিয়েছে। অতি সন্তর্পণে ঠাণ্ডা ক'রে দেখেন, সমস্ত পাত্রের গায়ে সেগুলো শক্ত হয়ে লেগে গেল। তখন তাঁর দাঁড়াবার শক্তি নেই। সেই অবস্থাতেই বাড়ীতে ছুটে এসে স্ত্রীকে দেখালেন, আর ভয় নেই।

কিন্তু ওধারে কাচ-ওয়ালার উনুন বন্ধ হয়ে গেল। পালিসী স্থির করলেন, নিজের বাড়ীতে তিনি বড় উনুন তৈরী করবেন। কিছু দূরে এক গ্রামে একটা ইঁট-খোলা ছিল। সেখান থেকে নিজে ঘাড়ে ক'রে-ক'রে ইঁট বয়ে নিয়ে এলেন। বাড়ীর একধারে বিরাট উনুন তৈরী হলো।

এত-বড় উনুনের উপযুক্ত আঁচ তৈরী করতে হ'লে যে পরিমাণ কাঠ দরকার, তা কেনবার সামর্থ্য তাঁর ছিলনা। লোকে আর ধার দিতেও নারাজ। বহু কষ্টে আবার কিছু ধার ক'রে কাঠ কিনলেন। বাড়ীর একধারেই উনুন তৈরী হয়েছিল—তিনি সেখান থেকে আর নড়লেননা। এক দিন, দু'দিন, তিন দিন চলে গেল। কৈ, আর তো মশলা গলেনা! তবে কি এত বৎসরের এই অসাধ্য-সাধনের পরে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে?

কিন্তু কাঠ আর মেলেনা। নাই-বা মিললো। ঘরের আসবাবপত্রে তো অনেক কাঠ আছে! উন্মাদের মতন বাড়ীর দরজা-জানলা ভেঙে উনুনে ফেলতে লাগলেন। স্ত্রী আর থাকতে পারলেননা। উন্মাদিনীর মতন বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে প্রতিবেশীদের ডেকে তিনি জানালেন, পালিসী পাগল হয়ে গিয়েছে, দরজা-জানলা সব আগুনে পোড়াচ্ছে!

গ্রামের চারদিক থেকে মজা দেখবার জন্যে লোকে পালিসীর বাড়ীতে এসে উঁকি-ঝুঁকি মারতে লাগলো। ছেলে-বুড়ো সকলেই পাগল ব'লে তাকে ক্ষ্যাপাতে আরম্ভ করলো। নিজের স্ত্রীও তাকে উন্মাদ বিবেচনা ক'রে বাধা দিতে লাগলেন। উন্মাদ সব কথা নীরবে শোনেন, আর শুধু চেয়ে থাকেন, আগুনের আঁচ নিভে আসে কিনা!

কাঠ ফুরিয়ে গেলে, বিছানা-মাদুর যা হাতের কাছে পেলেন, তাই আগুনে সমর্পণ করতে আরম্ভ করলেন। যারা টাকা পেতো, পালিসী পাগল হয়ে গেছে শুনে বাড়ীতে এসে তাঁকে গালাগাল দিয়ে যেতে লাগলো। কেউ-কেউ এমন কথাও শুনিয়ে গেল, বদমায়েসী ক'রে পাগল সেজেছে।

পালিসী কারুর কথাতেই কান দেননা। শরীর তাঁর কঙ্কালসার হয়ে

গিয়েছে। কি হবে শরীরে, যদি সাধনার ধন না মেলে? ছেলেমেয়েদেব মুখ দেখা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কি হবে সংসারের মায়ায, যদি মন যায মবে? পোষাক-পরিচ্ছদ যা ছিল, সমস্ত বিক্রি ক'রে ফেলেছেন। সামান্য একটি জীর্ণ পরিচ্ছদে দিন চলে যায়। কি হবে পরিচ্ছদে, যদি জীবনই হযে যায় ব্যর্থ? লোকে
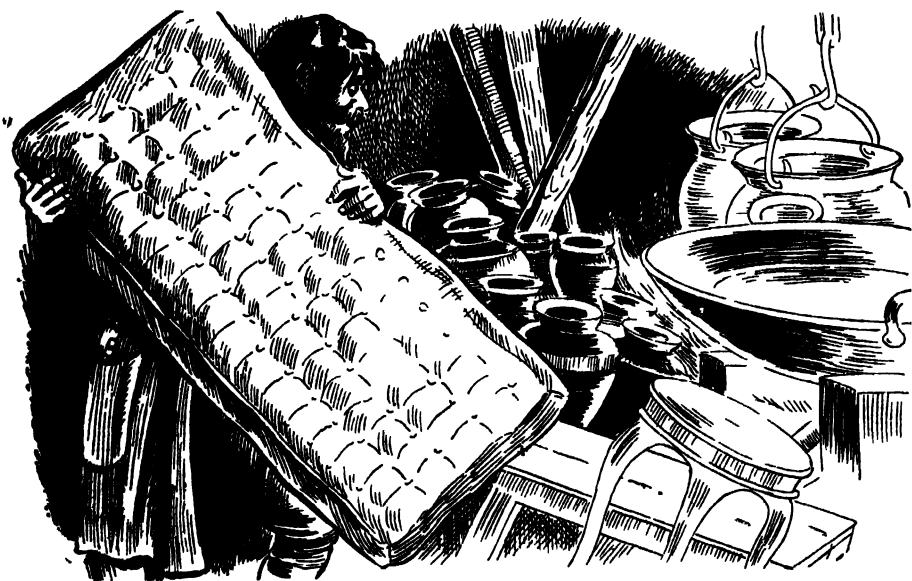
—যা হাতেব কাছে পেলেন, সব আগুনে সমর্পণ কবলেন—

উপহাস করে, গালাগাল দেয। কি হবে লোকেব প্রশংসায়, যখন জীবনের চরম ক্ষণে কেউ একবার পাশে এসে দাঁড়ায়না! জীবনেব শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত্ত তো এমনি নিঃসঙ্গ! উন্মাদের শুধু এক চিন্তা, আগুনের শিখা না নিভে যায়!

যুগে-যুগে এই তপস্যাই মাটির পৃথিবীকে স্বর্গের মহিমা দান করেছে।

একদিন বাইয়ে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। কোনো রকমে একটা কাঠের ভাঙা জানলা বন্ধ ক'রে পালিসীর স্ত্রী—পুত্র-কন্যাদের নিয়ে ঝড়-বৃষ্টি থেকে

আত্মরক্ষা ক'রে আছেন—হঠাৎ দেখেন, অন্ধকারে ভূতের মতন কে এসে, দুটো শীর্ণ হাত বাড়িয়ে সেই জানলাটাও খুলে নিয়ে গেল।···উন্মাদ ঝড়ো-হাওয়া ঘরকে দুলিয়ে দিয়ে গেল। পালিসীর স্ত্রী আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন।

কে জানতো, সেদিন ফ্রান্সের এক নগণ্য শহরে এই যে তপস্বী এইভাবে ষোলো বৎসর ধ'রে তপস্যা করেছিলেন, সেই ষোলো বৎসরের প্রত্যেক দিনটি সত্য!

কোনো দিন কোনো তপস্যা ব্যর্থ যায়না। পালিসীর তপস্যাও ব্যর্থ হয়নি। ষোলো বৎসর পরে তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন। এনামেলের উপর তাঁর অপূর্ব্ব কারুকার্য্য দেখে, দেশ-দেশান্তরে তাঁর যশ ছড়িয়ে পড়লো। রাজারা সমাদর ক'রে রাজপ্রাসাদে ডেকে নিয়ে তাঁকে কাজের ভার দিতে লাগলেন। জ্ঞানীরা তাঁর মুখে বিজ্ঞান-কথা শোনবার জন্যে দূর-দূরান্তর থেকে সমবেত হতে লাগলেন। মান, প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য্য—অজস্রধারায় আসতে লাগলো।

দীর্ঘ ঊন-আশী বৎসবকাল তিনি জীবিত ছিলেন। পর-পর প্রথম ফ্রান্সিস্, দ্বিতীয় হেনরী ও নবম চার্লস্‌কে তিনি ফ্রান্সের সিংহাসনে বসতে দেখেছেন। প্রত্যেক রাজাই তাঁকে ভালোবাসতেন। পালিসীর বেঁচে থাকবার পক্ষে রাজাদের এই অনুগ্রহের একান্ত প্রয়োজন ছিল। তার কারণ, ফ্রান্সে তখন স্বাধীন ধর্ম্মমতের জন্যে মানুষকে জীবন-দান পর্য্যন্ত করতে হতো! রাজা যে-ধর্ম্মের অনুমোদন করেন, সে-ধর্ম্মের বিরুদ্ধ মত যাঁরা পোষণ করতেন, তাঁদের মৃত্যুদণ্ড হতো। কোনো বিচার নেই, কোনো বিতর্ক নেই, হয় রাজ-অনুমোদিত ধর্ম্ম স্বীকার করতে হবে, নয় মৃত্যুদণ্ডকে বরণ করতে হবে।

পালিসী রাজ-অনুমোদিত ধর্ম্মে বিশ্বাস করতেননা। মানুষ তার ধর্ম্মমতের জন্যে কারুর কাছে দায়ী নয়। কারুর কোনো ক্ষমতা নেই, মৃত্যু-দণ্ড দেখিয়ে, বা অন্য কোনো ভয় দেখিয়ে, ধর্ম্মের স্বাভাবিক গতিকে বাধা দেবার। সেই যুগে পালিসীর ছিল এই মত। কিন্তু তবু যখনই তাঁর জীবনের উপর আক্রমণ হয়েছে, রাজ-অনুগ্রহে তিনি রক্ষা পেয়ে এসেছিলেন। প্রত্যেক রাজাই তাঁকে ধর্ম্মমত

পরিবর্ত্তিত করবার জন্যে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি কারুরই অনুরোধ রক্ষা করেননি।

নবম চার্লসের পর তৃতীয় হেন্‌রী ফ্রান্সের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। পালিসীর তখন ৭৬ বৎসর বয়স। বার্দ্ধক্যে শরীর নুয়ে পড়েছে। সেইসময় একদিন সহসা রাজার সৈন্যরা এসে তাঁকে বন্দী ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, প্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে তিনি প্রচার করেন।

তৃতীয় হেন্‌রী তাঁকে ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন করতে অনুরোধ করলেন। ছিয়াত্তর বৎসরের বৃদ্ধ সেই অনুরোধ উপেক্ষা ক'রে অন্ধকার বায়ুহীন ভূ-গর্ভের কারাগারে প্রবেশ করলেন।

—তৃতীয় হেন্‌রী বৃদ্ধকে মত পরিবর্ত্তন করতে অনুরোধ করলেন—

দু'বছর পরে রাজা তৃতীয় হেন্‌রী একদা সেই কারাগারে উপস্থিত হয়ে বৃদ্ধকে আবার মত পরিবর্ত্তনের জন্যে অনুরোধ করলেন। অশীতিপর-বৃদ্ধ কারান্ধকারে দাঁড়িয়ে

সে-অনুরোধ উপেক্ষা করলেন। দুঃখিত হয়ে তৃতীয় হেন্‌রী সেদিন বলেছিলেন, “আপনার জন্যে আমার দয়া হয়। ৪৫ বৎসর ধ’রে আপনি আমাদের কাজ ক’রে এসেছেন। আমার আগে যাঁরা সিংহাসনে বসেছিলেন, তাঁরা আপনাকে আগ্‌লে থেকে, নির্য্যাতিত হতে দেননি। কিন্তু আমি আর পারছিনা। পাত্র-মিত্রদের দ্বারা বাধ্য হয়ে আমি শেষবার আপনাকে জানিয়ে যাচ্ছি, যদি আপনি মত পরিবর্ত্তন না করেন, তাহ’লে আপনাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হবে!”

ফ্রান্সের সেই রাজার দিকে একবার চেয়ে তাপস-শ্রেষ্ঠ সেদিন সেই কারাগারে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, “আপনার যা দণ্ড দেবার, আপনি তা দিন। শুধু এই-কথা বলবেননা যে, আমার জন্যে আপনার অনুকম্পা বোধ হচ্ছে। আমি জগতে কারুর অনুকম্পার পাত্র নই। তার বদলে শুনে যান, আমিই আপনাকে অনুকম্পা করি— যে রাজা হয়ে একজন বন্দীর কাছে এসে বলে, আমি পাত্র-মিত্রদের দ্বারা বাধ্য হয়ে এই কাজ করেছি!”

তৃতীয় হেন্‌রী ফিরে গেলেন।

পালিসী সেই অন্ধকার কারা-কক্ষেই রইলেন। তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবার আদেশ তৃতীয় হেন্‌রীকে আর দিতে হয়নি। কারণ, তার পূর্ব্বেই সেই অন্ধকার কারা-কক্ষে তাঁর দেহাবসান ঘটে।

এই তপস্বীর জন্মভূমি ব’লে ফ্রান্সের ছেলে-মেয়েরা আজ নিজেদের ধন্য মনে করে; মনে করে তারা ধন্য, যারা সেই মাটিতে জন্মেছে, যে-মাটিতে একদিন পালিসী জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

———

প্রিন্স হেনরী

প্রিন্স হেন্‌রী চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পর্ত্তুগালে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পর্ত্তুগালেব একজন রাজকুমার। কিন্তু জগতের ইতিহাসে তাঁর নাম পর্ত্তুগালের যুবরাজ হিসাবে বেঁচে নেই—বেঁচে আছে, জগতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেশ-আবিষ্কর্ত্তা হিসাবে। আফ্রিকাব সঙ্গে তিনিই প্রথম য়ুরোপেব পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁরই চেস্টা এব সাধনার ফলে য়ুরোপীয়-নাবিকদের দৃষ্টি মহাসাগবের অপব-পারের দিকে আকৃষ্ট হয়। সেইজন্য ইতিহাসে তাঁর আর-এক নাম—হেন্‌রী দি ন্যাভিগেটর, **Henry the Navigator.**

তার পিতাব তিনি দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন। রাজ্য শাসন করবার দায়িত্ব থেকে মুক্তিলাভ ক'রে তিনি জ্ঞান-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর মা'র নাম ছিল ফিলিপা।

পর্ত্তুগালের রাজা—রাজা জন ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-আফ্রিকার উপকূলে কৌটা শহর অধিকার করবার আয়োজন করেন। কিন্তু সমুদ্র বেয়ে সেই অজানা দেশে গিয়ে মূরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কারুর সাহস হলোনা। অবশেষে প্রিন্স হেন্‌রী

সে-ভার গ্রহণ করলেন। কথিত আছে, যাত্রা করবার সময় প্রিন্স হেন্‌রী শুনলেন যে, তাঁর মা মৃত্যুশয্যায়।

মা'র মৃত্যুশয্যার পাশে গিয়ে হেন্‌রী দাঁড়ালেন। ফিলিপা ছেলেবেলা থেকেই ছেলেকে সমুদ্র-যাত্রার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন—মৃত্যুর শেষ মুহূর্তে তিনি শেষ অনুপ্রেরণা দিয়ে গেলেন।

পুত্রকে পাশে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ দিক থেকে এত জোরে হাওয়া এসে প্রাসাদে লাগছে?

পুত্র উত্তর দিলো, উত্তর দিক থেকে।

—এই তোমার অনুকূল বাতাস···বিলম্ব কোরোনা·· এখনি যাত্রা করো।

এই কথা কয়টি বলেই ফিলিপা প্রাণত্যাগ করলেন।

প্রিন্স হেন্‌রী মূরদের কাছ থেকে 'কৌটা' দখল করায়, তার নাম সারা য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়লো। ইংলণ্ডের রাজা পঞ্চম হেন্‌রী তাকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন যে, ইংলণ্ডে এসে তিনি ইংলণ্ডের নৌ-সেনার ভার গ্রহণ করুন। কিন্তু হেন্‌রী সেসব প্রত্যাখ্যান ক'রে দক্ষিণ-পর্ত্তুগালের এক নির্জ্জন উপকূলে সমুদ্রের উপর একটা প্রাসাদ, একটা পাঠাগার, একটা বীক্ষণাগার নির্ম্মাণ করলেন। সেখান থেকে সমুদ্রের দিকে চেয়ে দিবারাত্র চিন্তা করতে লাগলেন—কেমন ক'রে সমুদ্রের বাধা উল্লঙ্ঘন ক'রে অজানা আফ্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় করা যায়। তিনি শুধু চুপ ক'রে ব'সে চিন্তাই করতে লাগলেন, তা নয়—দলে-দলে নতুন নাবিকও তৈরী করতে লাগলেন, যাদের উৎসাহ আছে সমুদ্রের তরঙ্গকে বরণ করবার। সেই সঙ্গে-সঙ্গে তিনি সেই-সময়কার সমস্ত ভৌগোলিক-তত্ত্বও পড়তে লাগলেন এবং দেশের সমস্ত বড়লোককে একত্র ক'রে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন।

কোনও মূরের দেখা পেলেই আফ্রিকার ভিতরকার অবস্থা সম্বন্ধে তাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিতেন। মরক্কো, আলজিরিয়া থেকে যে-সমস্ত মূর-বণিকরা য়ুরোপের বাজারে বাটনার-মশলা বিক্রি করতে আসতো—সে-সময় য়ুরোপ উত্তর-আফ্রিকার

উপকূলের বণিকদের কাছ থেকে প্রভূত পরিমাণে সেইসব মশলা কিনতো, নিজেদের খাবার জন্যে। সে-সময়কার রান্নাঘরের খবর যে-সমস্ত ঐতিহাসিক বা সাহিত্যিক রেখে গেছেন, তা-থেকে জানা যায় যে, সে-সময়কার য়ুরোপীয়রা তরকারীতে খুব বেশী পরিমাণে মশলা খেতে ভালোবাসতো। সেই-সব মূর-বণিকদের কাছে প্রিন্স হেন্‌রী গল্প শুনতেন—আফ্রিকার ভিতরকার গল্প, গোল্ড-কোস্টের কথা—অপর্য্যাপ্ত ঐশ্বর্য্য আছে সেখানকার মাটির মধ্যে; সেখানকার সীমাহীন জঙ্গলে আছে অফুরন্ত সব মশলার গাছ—কোনো সাদা-মানুষের পায়ের দাগ এখনো পড়েনি সেখানে। সেখানকার সেইসব সীমাহীন বনে-বনে ঘুরে বেড়ায় দলে-দলে অসংখ্য হাতী, অসম্ভব রকমের সব জানোয়ার। প্রিন্স হেন্‌রী ধীরভাবে সব শোনেন এবং মনে-মনে স্থির করেন যে, যেরকম করেই হোক্ আফ্রিকার ভিতর ঢুকতেই হবে।

প্রথমে তিনি দু'জন লোকের উপর ভার দিয়ে কয়েকখানা নৌকা পাঠালেন। তারা যথাসাধ্য উপকূল ধ'রে যেতে-যেতে হঠাৎ ঝড়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে একেবারে সমুদ্রে দিশেহারা হয়ে পড়লো। জীবনের সকল আশা ত্যাগ ক'রে, ভাগ্যকে ভরসা ক'রে পাড়ি দিতে গিয়ে হঠাৎ তারা স্থল দেখতে পেলো—একটা দ্বীপ—তারা তার নাম দিলো, পোর্টোসান্টো, Porto Santo, এই দ্বীপের গভর্ণরের মেয়ের সঙ্গেই কলম্বাসের বিবাহ হয়। এইভাবে তারা মাদিরা, Madira দ্বীপ আবিষ্কার করে। কেপ-বোজাডোর পর্য্যন্ত যেতে কেউ সাহস করতোনা—সকলের তখন একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, আর বেশীদূর গেলেই দৈব-অভিশাপে গায়ের সাদা-রঙ কালো হয়ে যাবে। তখন এইসমস্ত কুসংস্কারকে লোকে রীতিমত মানতো। কিন্তু প্রিন্স হেন্‌রীর চেষ্টায় কেপ-বোজাডোর, কেপ-ব্ল্যাঙকো পর্য্যন্ত পর্তুগীজরা আবিষ্কার করে। এমনি Sierra Leone, সিয়েরা লিওনের কাছাকাছি পর্য্যন্ত যায়। এইখান থেকে পর্তুগীজ নাবিকরা-এক-মুঠো সোনার-ধুলো আর ত্রিশটি নিগ্রো নিয়ে আসে। নিগ্রোদের দেখে পর্তুগালের লোকেরা তো বিস্ময়ে অবাক! মানুষ যে এত কালো হতে পারে, তাদের ধারণাই ছিলনা।

এই সময় থেকে মানব-সভ্যতার ইতিহাসে একটা আত্ত কলঙ্কময় ঘটনার সূত্রপাত

হয়। সেটা হলো—ক্রীতদাস ব্যবসায়। পর্ত্তুগীজ-নাবিকরা লোভে অন্ধ হয়ে এই অতি ঘৃণ্য-ব্যবসায় নির্ম্মম ভাবে চালাতে থাকে। প্রিন্স হেনরীর সাহায্যে এবং উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে তখন দলে-দলে নাবিক আফ্রিকার অজানা পথের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। এবং এই ঘটনার পর থেকেই য়ুরোপীয় নাবিক এবং পর্য্যটকদের দৃষ্টি আফ্রিকার দিকে পড়লো।

অবশ্য সে-দৃষ্টির মধ্যে বৈজ্ঞানিক-অনুসন্ধিৎসার চেয়ে, লোভই ছিল বেশী। কিন্তু সে যাই হোক, এইভাবে ধীরে-ধীরে আফ্রিকার মানচিত্র সম্বন্ধে মানুষের ধারণা বাড়তে লাগলো।

আগে আফ্রিকাকে বলতো—ডার্ক কনটিনেণ্ট্। অজানা অন্ধকার ঘরে কোনো একটা কিছু খুঁজতে হ'লে যেমন কিছুই দেখা যায়না···পাওয়া যায়না···তেমনি এই মহাদেশ অন্ধকারে অজানা হয়ে পড়েছিল। ইংরেজ-লেখক সুইস্‌টের নাম তোমরা হয়তো শুনেছো। তিনি আফ্রিকা সম্বন্ধে একটা কবিতায় লেখেন,—

Geographers, in Africa maps
With savage pictures filled their gaps,
And over unhabitable downs
Placed elephants for want of towns.

অর্থাৎ আফ্রিকা সম্বন্ধে আমাদের এত অল্প ধারণা যে, শুধু কতকগুলো অসভ্য লোকের ছবি দিয়ে ম্যাপ ভরাতে হ'তো, হাতী বসিয়ে নগর বানাতে হতো। সেদিনও এন্‌সাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার তৃতীয় সংস্করণে লেখা হয় যে, The Gambia and Senegal rivers are only branches of the Niger—অথচ আসলে ও তিনটে আলাদা নদী।

———

উড়িষ্যার বীর বালক

১৮৬৬ সালে উড়িষ্যায় একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। তিন বছর ধ'রে এই দুর্ভিক্ষ থাকে। মাঠে কোথাও একটি ঘাস পর্য্যন্ত ছিলনা; গাছে একটিও পাতা ছিলনা। সূর্য্যের তেজে সব শুকিয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টি নেই—শুক্‌নো আকাশ থেকে এক ফোঁটাও বৃষ্টি পড়েনি! সূর্য্যের তেজে শুকিয়ে যাবার আগে যাও-বা লতা-পাতা ছিল, খিদের তাড়নায় মানুষ তাও খেয়ে ফেলেছে! দিনের পর দিন যায়। কুকুর, বেরাল, গরু-বাছুরের সঙ্গে দলে-দলে মানুষ পথে-ঘাটে মরে প'ড়ে থাকে। তবুও আকাশ থেকে এক ফোঁটা জল পড়লোনা।

এইসময়ে এক দরিদ্র-পরিবারে সনাতন নামে একটি ছেলে ছিল। সংসারে তারা ছিল চারজন প্রাণী। সে, তার বাবা, তার মা, আর তার এক ছোট ভাই। ঘরে খাবার যা ছিল তা কবে ফুরিয়ে গিয়েছে। একজোড়া বলদ ছিল; অনেক ঘুরে চার-মুঠো চালের বিনিময়ে তাও বিক্রি করলো। চার-মুঠো চাল আর ক'দিন থাকে!

এক মাস ধ'রে সনাতনের বাবা আর মা একবেলা ক'রে কোনো রকমে লতা-পাতা সেদ্ধ ক'রে খেয়ে, ছেলে দুটোর মুখে দু'বেলা কিছু খাবার যোগাড় ক'রে দিতো।

একদিন রাত্রিবেলায় সনাতন শুনলে, তার বাবা তার মাকে বলছে—আর কিছু কোথাও মিলছেনা···কালকে থেকে আমি আর কিছু খাবোনা ভেবেছি···কিন্তু ছেলে দুটোকে কি দেবো?

ভোর না হইতেই সনাতন কাউকে কিছু না ব'লে বেরিয়ে পড়লো। আজ যেমন ক'রে হোক্ সে কিছু খাবার যোগাড় ক'রে আনবেই। কিন্তু যতদূর যায় কোথাও সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। মাথার ওপরে যেন আগুনের কড়াকে উল্টে দিয়েছে··· চোখের সামনে সারি-সারি গাছের কঙ্কাল···পায়ের তলায় একটি ঘাস পর্য্যন্ত নেই। সারাদিন ঘুরে খিদেয় আর তেস্টায় পরিশ্রান্ত হয়ে হতাশ মনে সনাতন বাড়ী ফিরে এলো।

তার মা ভিক্ষে ক'রে এক-বাটি ফ্যান্ তার জন্যে যোগাড় ক'রে রেখেছিল। সনাতন এসে দ্যাখে, তার ছোট ভাইটি খিদেয় নড়তে পারছেনা। সেই ফ্যানের বাটি নিয়ে সনাতন ছোট ভাইটিকে খাওয়ালে। মাকে বললে, মা, কাল তুমি দেখো, আমি যেমন ক'রে পারি কিছু খাবার নিশ্চয়ই নিয়ে আসবো।

প্রতিদিন সকালবেলা সনাতন বাড়ী ছেড়ে চলে যেতো।

রাত্রিবেলা কোনোদিন একমুঠো ঘাস, কি কতকগুলো পাতা নিয়ে ফিরতো। কিন্তু এরকম ক'রে আর কতদিন চলবে?

সনাতনের বাবার দিন ঘনিয়ে আসছিল। সেও আর উঠে হেটে বেড়াতে পারতোনা। চোখের সামনে ছেলেদের সেই কাতর মুখ না দেখতে পেরে, একদিন স্ত্রীকে ডেকে বললে, দ্যাখো, আমার জন্যে ভেবোনা, আমি চল্লুম, যদি খাবার পাই তো ফিরবো—নইলে জেনো আর এলামনা।

সবাই মুমূর্ষু। কারুর শক্তি নেই কারুকে বাধা দেয়। কোনো রকমে টলতে-টলতে সনাতনের বাবা চলে গেল। কিন্তু সে আর ফিরে এলোনা। সনাতনের ওপর ভার পড়লো সমস্ত সংসারের খাবার যোগাড় করবার।

কঙ্কালসার মূর্ত্তি নিয়ে সনাতন রোজ সকালবেলায় খাবারের সন্ধানে বেরুতো। কোনো দিন দু-একমুঠো ভাত জুটতো, কোনোদিন জুটতোনা। অবশেষে কোনো-

রকমে খাদ্য পাওয়াও একান্ত দুরূহ হয়ে পড়লো। কঙ্কালসার ভাইটিকে নিয়ে সনাতনের মা মাটি কামড়ে শুয়ে পড়লো।

সনাতন সেই কঙ্কালসার দেহ নিয়ে আবার বেরুলো। আজ তিনদিন সে নিজে দাঁতে কাটেনি কিছু। নিজের কথা তার একেবারেই মনে নেই—তার চোখের সামনে ছিল শুধু তার মা আর তার ভাই-এর সেই চেহারা! এক দূর গ্রামে গিয়ে সেদিন ভাগ্যক্রমে দেখলে যে. একটি বৃদ্ধা ভাত বাঁধছে। বহু কাকুতি-মিনতি ক'রে তার কাছে কয়েক-মুঠো ভাত ভিক্ষে ক'রে পেলে। তারপর সেই ভাত কাপড়ের খুঁটে বেঁধে ঘরের দিকে ফিরলো।

ফেরবার পথে তাব পা আর চলেনা। খিদের তাড়নায় তাব সমস্ত দেহ তখন আর্ত্তনাদ ক'রে উঠছিল। ক্রমে তার চোখের সামনে সমস্ত অন্ধকার হয়ে আসতে লাগলো। কে যেন তার দেহের ভেতর থেকে বলতে লাগলো—সনাতন, তোমার আঁচলে ভাত বাঁধা রয়েছে, তুমি খেয়ে বাঁচো। দু-তিনবার সনাতন পথে ব'সে পড়লো—আঁচলের গেরো পর্য্যন্ত খুললো—কিন্তু একটাও দানা মুখে দিতে পারলোনা। ওদিকে অন্ধকারে. একলা-ঘরে তার মা আর তার ভাই এখনো হয়তো তার অপেক্ষায় বেঁচে আছে! সনাতন পুঁটলী বেঁধে আবার হাটতে আরম্ভ করলো।

কিন্তু পথে রাত নেমে এলো। মাথার ওপরে পরিষ্কার আকাশে একটা জ্বলজ্বলে তারা জ্বলে উঠলো। সনাতন আর চলতে পারলোনা। পথের ধারে অবশ অচৈতন্য হয়ে প'ড়ে গেল। বেশ শক্ত মুঠো ক'রে বুকের মধ্যে সেই ভাতের পুঁটলীটা চেপে ধ'রে--আকাশের সেই জ্বল্‌জ্বলে তারাটিব দিকে একবার চেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়লো···

কয়েকদিন পরে একদল লোক দুর্ভিক্ষ নিবারণ করতে বেরিয়ে দেখলো, পথের ধারে একটি ছেলে না খেতে পেয়ে মরে প'ড়ে আছে···কিন্তু তার বুকে তখনো মুঠোতে-ধরা ভাতের পুঁটলী!

—

তোমরা টলস্টয়ের জীবনী এই 'ধ্রুবতারা'র গোড়ার দিকে পড়েছো। কিন্তু ছেলেদের জ্ঞান-বুদ্ধি দেবার জন্যে তিনি যেসব অমূল্য বই লিখেছিলেন, তার মধ্যে থেকে একটি ছোট্ট কাহিনী আজ তোমাদের শোনাবো। সৎপথে থেকে, সৎ-চিন্তা ক'রে মানুষ মহৎ ভাবে কি ক'রে জীবন-যাপন করতে পাবে, তাঁর সমস্ত লেখার মধ্যে তিনি তাই-ই আলোচনা ক'বে গিয়েছেন। ছেলেদের তিনি বড় ভালোবাসতেন। প্রত্যেক দেশে, শুধু কতকগুলো বই মুখস্থ করিয়ে ছেলেদের যে লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা আছে, তিনি তার বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন যে, "আমবা ছেলেদের বুঝিনা। তাদের মন, বয়স্থ লোকদের মনের চেয়ে ঢের পবিত্র এবং তারা অনেকসময় অনেক বড়-বড় জিনিস বেশ সহজভাবেই মনে গ্রহণ করতে পারে। অনেক সত্য তাদের মুখ দিয়ে প্রকাশ পায়। সেইজন্য তাদের লেখা-পড়া শেখানো খুব সহজ ব্যাপার নয়।" ছেলেদের সঙ্গে মিশে, ছেলেদের কথাবার্ত্তা লক্ষ্য ক'রে তিনি একখানা বই লেখেন। বইটির নাম হলো, The Wisdom of Children—'ছেলেদের জ্ঞান-বুদ্ধি'।

এই বইটিতে ধর্ম্ম, যুদ্ধ, স্বদেশ, কর-প্রথা, বিচার, দয়া, শ্রম ও মূল্য, মদ্য-পান, ফাঁসি-দেওয়ার প্রথা, কারাগার, ধন-সম্পদ, প্রেস ও খবরের কাগজ, কলা-শিল্প, বিজ্ঞান, মামলা-মোকদ্দমা, সম্পত্তি, শিশু এবং শিক্ষা সম্বন্ধে ছেলে-মেয়েরা কিভাবে এবং

যাদের উপর ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার আছে, তাঁরাই-বা কিভাবে ছেলেদের সেইসব প্রশ্নের সমাধান করেন, সেগুলি ছোট-ছোট কথোপকথনের ছলে তিনি দেখিয়েছেন। জগতে এই ধরনের বই বোধহয় এই একখানি, এবং এই বই একমাত্র টলষ্টয়ই লিখতে পারতেন। আজকে তোমাদের জন্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথোপকথনটি অনুবাদ ক'রে দিলাম।

ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ছেলে ও মা'র কথোপকথন

ছেলে: মা, আজকে সবাই ভালো জামা-কাপড় পরেছে কেন? আমাকে কেন এইসব ভালো জামা-কাপড় পরিয়ে দিলে?

মা: আজ ছুটির দিন। আমরা সবাই এখন গির্জ্জেয় যাবো।

ছেলে: ছুটি কেন, মা?

মা: আজ তাঁর আরোহণের দিন!

ছেলে: আরোহণের দিন—কি মা?

মা: তিনি অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্ট আজ স্বর্গে আরোহণ করেছিলেন।

ছেলে: তাঁর বুঝি ডানা ছিল?

মা: না, তাঁর কোনো ডানা ছিলনা। বিনা ডানাতেই তিনি বাতাস বেয়ে স্বর্গে উড়ে গিয়েছিলেন। তিনি ভগবান। তিনি ইচ্ছা করলে সবই করতে পারেন।

ছেলে: কিন্তু আকাশের ওপারে তিনি গেলেন কোথায়? বাবা বলেন, আকাশে কোথাও কিছু নেই—শুধু মাঝে-মাঝে, অনেক দূরে-দূরে আছে সব নক্ষত্র, তারও ওপারে আছে আরও সব নক্ষত্র। তিনি তবে উড়ে কোথায় গিয়ে উঠলেন?

মা: (হেসে) তোর বয়স অল্প, সব জিনিস কি তুই এখন বুঝতে পারবি? যা শুনবি, তাই বিশ্বাস ক'রে নিবি।

ছেলে: কার কথা বিশ্বাস করবো?

মা: বড়রা যা বলবেন, তাই বিশ্বাস করবি।

ছেলে ঃ তবে সেদিন যখন আমি বললাম যে, দিদিমা বলেছিল—একটা লোক রাত্তিরবেলায় গাছের পাতা ছুঁয়েছিল ব'লে মরে গেল, তুমি কেন আমাকে ধম্‌কে উঠে বললে, ওসব যা-তা কথা বিশ্বাস করতে নেই ?

মা ঃ ধম্‌কাবই তো। তা ব'লে যা-তা বিশ্বাস করবি ?

ছেলে ঃ কিন্তু আমি কি ক'রে বুঝবো, কোন্‌টা যা-তা, কোন্‌টা যা-তা নয় ?

মা ঃ সত্যিকার ধর্ম্মে যা বলে তাই বিশ্বাস করবি ; ধর্ম্মে যা বলেনা, তা বিশ্বাস করবিনা।

ছেলে ঃ সত্যিকারের ধর্ম্ম আবার কাকে বলে, মা ?

মা ঃ আমাদের ধর্ম্মই হলো সত্যিকারের ধর্ম্ম। (চুপি-চুপি নিজের মনে) তাই তো, আমিই যা-তা বলতে আরম্ভ ক'রে দিলাম দেখছি ! (গলা জোর ক'রে) যাও, এখন ওসব কথা থাক্, তোমার বাবার কি হলো দেখ, গির্জ্জের সময় হয়ে গেল।

ছেলে ঃ গির্জ্জে থেকে ফিরে এলে, চকলেট দেবে-তো ?

———

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন আমেরিকার সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধ বাধে, সেই সময়কার একটা ঘটনা আজ তোমাদের বলবো। সে-ঘটনাটি সকলের জানা দরকার।

কিছুদিন যুদ্ধ চলবার পর, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির কাছ থেকে একটা বিশেষ দরকারী চিঠি 'কিউবা'র যে স্পেনীয়-নেতা আছেন, তাঁর কাছে পৌঁছে দেবার প্রয়োজন হলো। এই নেতার নাম—গার্সিয়া। গার্সিয়া কোন্ দলে যোগদান করবেন, সে-কথা স্পষ্ট ক'রে জানার বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

এই যুদ্ধ উপলক্ষে তখন কিউবাতেও নানা রকমের বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে। গার্সিয়া, বিদ্রোহী-দলের নেতা হয়ে কিউবার কোন্ পার্ব্বত্য-অঞ্চলের অরণ্যের মধ্যে আছেন, তা কেউ-ই বলতে পারেনা। মাঝে-মাঝে তাঁর সৈন্যেরা রাত্রিতে অতর্কিতে দেখা দেয়, আবার কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়, তাও কেউ বলতে পারেনা। যতদূর খবর পাওয়া গিয়েছে, তাতে জানা যায় যে, 'কিউবা' শহর থেকে বহু দূরে পর্ব্বতের উপরে এক বিরাট বনের ভিতরে কোথাও গার্সিয়া থাকেন। সেখানে কোনো পোষ্টআফিসের পিয়ন কোনোদিন যায়নি। এখন ব্যাপার হলো এই, অজানা জায়গায় গার্সিয়াকে খুঁজে বের ক'রে নিউ-ইয়র্ক থেকে কে নিয়ে যাবে, যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির সেই চিঠি?

দিনের পর দিন যায়। সভাপতি নিরুপায়। কোনোরকমে গার্সিয়ার কোনো খবর তিনি সংগ্রহ করতে পারেননা। কোথায় পাঠাবেন চিঠি? আর, নিয়ে যাবেই-বা কে? অথচ গার্সিয়ার সাহায্য না পেলেই নয়।

একদিন হঠাৎ একজন সেনাপতি তাঁকে বললেন, আপনার কাছ থেকে গার্সিয়ার কাছে যে-লোকটি খবর নিয়ে যাবে, তাকে খুঁজে পেয়েছি। তার নাম হোলো—রোয়েন। একজন সৈনিক।

সভাপতি রোয়েনকে ডেকে পাঠালেন—

জিজ্ঞাসা করলেন, জানো, কোথায় গার্সিয়া আছেন?

—না।

—খুঁজে এই চিঠি তুমি তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে পারবে?

—চেষ্টা করবো।

লোকটির ভঙ্গী দেখে সভাপতির মনে হলো, এ-যেন পারবে। তখন তার হাতে দিলেন সেই চিঠি।

রোয়েন চিঠিটা নিয়ে কোমরের বেল্টের ভেতরে একটা গোপন-পকেটে রাখলো। বেল্টটা টেনে আরও একটু শক্ত ক'রে নিলো। তারপর অভিবাদন ক'রে অদৃশ্য হয়ে গেল সে!

চারদিন পরে এক অন্ধকার রাত্রিতে কিউবার ধার দিয়ে একটা ছোট্ট খোলা নৌকো চলেছে। এক পাহাড়ের গায়ে নৌকাটা রেখে, লোকটি অন্ধকার পাহাড়ের উপর উঠলো। লোকটির নাম—রোয়েন।

তিন সপ্তাহ চলে গেল, তার আর কোনো খবর নেই। তিন সপ্তাহ পরে হঠাৎ একদিন আবার সেই অন্ধকার-রাত্রিতে একটি লোককে দেখা গেল। নৌকো খুলে অন্ধকারে ঢেউয়ের মধ্যে আবার সে অদৃশ্য হয়ে গেল! লোকটির নাম—রোয়েন।

জগতের ইতিহাসে এক মুহূর্ত্তের জন্যে এই লোকটি এসেছিল, যার নাম—রোয়েন। একবার অন্ধকারের মধ্যে সকালের আলোয় তার মুখটা দেখা গিয়েছিল, তারপর আবার অন্ধকারে সে কোথায় মিলিয়ে গেল, যার নাম ছিল—রোয়েন।

এই এক মুহূর্ত্তের বেঁচে-থাকার কথা—তার একটি ছোট্ট ডায়েরীতে সে নিজেই সামান্য দু-এক কথায় লিখে রেখে গিয়েছিল :

"২৩শে এপ্রিল। আদেশ পেলাম, যেমন ক'রে হোক্, জন্ গার্সিয়ার সঙ্গে দেখা করো। সকাল দশটার সময় একজন ইংরেজ-শিকারীর বেশ ধারণ করলাম। জামাই-কা পার হলাম। পরের দিন রাত একটার সময় সেণ্ট-অ্যানীর উপসাগরে এসে পৌঁছোলাম।

একটি ছোট্ট নৌকা নিলাম। ভোরবেলায় ক্যারিবি.ন্ সাগরে এসে ঢুকলাম। সেখান থেকে কিউবার উপকূলে এলাম প্রায় রাত এগারোটার সময়। তারপর ভোরের দিকে একটু সূর্য্যের আলো দেখা দিতেই বনের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

১লা মে। দুপুরবেলা, বিদ্রোহীদের ঘাঁটিতে এসে পৌঁছোলাম। গার্সিয়ার সঙ্গে দেখা হলো। গার্সিয়া সঙ্গে দূত পাঠালেন···পথ ব'লে দিলেন।

নতুন পথ দিয়ে যেতে-যেতে ৫ই মে সূর্য্যাস্তের পর আবার সমুদ্রের ধারে এলাম। সামনেই স্পেনীয়দের দুর্গ। সারি-সারি কামান পাতা, তারই মধ্যে দিয়ে রাত্রিবেলা অন্ধকারে পেরিয়ে এলাম। যখন ভোর হোলো তখন কিউবার-তীর আর দেখা যায়না।"

অতি অল্প কথায়, একান্ত অনাড়ম্বর ভাবে রোয়েন তার নিজের ডায়েরীতে এই ঘটনাটি এইভাবে লিখেছিল, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক-ইতিহাসের গোপন-খাতায় এই ঘটনাটিকে বলা হয়েছে—জগতের ইতিহাসে এর চেয়ে দুঃসাহসিক কাজ এত ধীর-স্থির ভাবে জগতের আর কোনো সৈনিক করেনি। পাহাড়-পর্ব্বত···বিপদ্‌সঙ্কুল অরণ্য···রাতের পর রাত, দিনের পর দিন, ভয়াবহ-ব্যাধিগ্রস্ত জলাভূমির মধ্য দিয়ে হাঁটা···সম্পূর্ণ অজানাকে এমন ক'রে খুঁজে বার করার এই কাহিনীকে—এলবার্ট

হাব্‌বার্ড ব'লে একজন বিখ্যাত আমেরিকান্‌ লেখক অমর ক'রে রেখেছেন। আমেরিকার প্রত্যেক ছাত্র এলবার্ট হাব্‌বার্ডের সেই-লেখার সঙ্গে পরিচিত—জগতের প্রত্যেক ছাত্রের উচিত সেই-লেখার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। তাই এখানে তার অনুবাদ ক'রে দিলাম। লেখাটির নাম তিনি দিয়েছেন, **'A message to Garcia'**—খবর দিতে হবে গার্সিয়াকে!

'কিউবা'র এই সময়কার সমস্ত ঘটনার মধ্যে একটি লোকের কথা বিশেষ ক'রে আমার মনে জাগরূক হয়ে আছে। মধ্য-দিনের সূর্য্যের মতন আমার মনের আকাশে আজও তার স্মৃতি দীপ্তিমান হয়ে আছে!

যখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে স্পেনের যুদ্ধ বেধে গেল, তখন 'কিউবা'র বিদ্রোহী-নেতাদের সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ করা এবং তাঁদের দলে আনতে চেষ্টা করা প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে উঠলো। এবং তার জন্যে সময়ও খুব অল্প। বিদ্রোহীদের নেতা 'গার্সিয়া' কোথায় আছেন—কেউ জানেনা। 'কিউবা'র পার্ব্বত্য অরণ্য-ভূমির নিবিড়তার মধ্যে কোথায় আছেন গার্সিয়া? কোনো পোষ্টআফিস, কোনো টেলিগ্রাফের তার, তাঁর কাছে পৌঁছোয়না। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতির আজ প্রয়োজন তাঁর সঙ্গে দেখা করার·· তাঁকে দলে আনার! অতএব, কি করা যায়?

কে এসে সভাপতিকে খবর দিলো, একটি অল্পবয়স্ক যুবক আছে, তার নাম হলো—রোয়েন। জগতে যদি কেউ গার্সিয়াকে খুঁজে বের করতে পারে, সেই পারবে!

রোয়েনকে ডেকে তার হাতে একখানি চিঠি দিয়ে দেওয়া হলো। আর শুধু ব'লে দেওয়া হলো, গার্সিয়ার হাতে এই চিঠি দিতে হবে।

তারপর কি অসাধারণ কষ্ট স্বীকার ক'রে, কি ভয়াবহ বিপদের মধ্য দিয়ে, শত্রুর দেশের মধ্যে পায়ে হেঁটে রোয়েন, গার্সিয়ার সঙ্গে দেখা ক'রে ফিরে এসেছিল, সে-কথা এখানে বলতে চাইনা। আজ আমি শুধু তোমাদের এই কথাটাই লক্ষ্য করতে বলি—ম্যাক্‌ ফিন্‌লে, রোয়েনকে একখানা চিঠি দিয়েছিলেন,

গার্সিয়াকে দিতে হবে এই কথা ব'লে ! রোয়েন কিন্তু সেই চিঠিটি হাতে নিয়ে, বিহ্বল হয়ে

—গাসিয়ার হাতে এই চিঠি দিতে হবে—

সেদিন জিজ্ঞাসা করেনি, যে, সে কোথায় থাকে ? কোথায় যাবো ? কখন দেখা পাবো ?

মহাকালকে সাক্ষী রেখে, এই ছেলেটির মৃত্যুহীন স্বর্ণ-মূর্ত্তি গড়িয়ে দেশের প্রত্যেক কলেজের প্রাঙ্গণে রেখে দেওয়া উচিত। যৌবনের উচিত নয়, শুধু বইয়ের কথা মুখস্থ ক'রে মেরুদণ্ডকে বেঁকিয়ে ফেলা। যৌবন চায়, তোমার মেরুদণ্ড আরও ঋজু হোক্, হোক্ আরও সবল, যে-সবলতা এনে দেবে, তোমাতে-ন্যস্ত দায়িত্বকে যে-কোনো উপায়ে রক্ষা করবার অচল শক্তি, কর্ম্মে অসীম তৎপরতা, এবং সকল ইন্দ্রিয়, সকল মানসিক শক্তিকে সংহত কেন্দ্রীভূত করবার ক্ষমতা···সামনের যে কাজ, তাকে করা চাই-ই।

কেন এ-কথা বলছি, তার প্রমাণ চাও? ধরো, তোমার অফিসে ব'সে আছো। তোমার ডাক শুনেই তুইজন কেরানী ছুটে এলো। তুমি একজন কাউকে ডেকে অনুরোধ করলে, "দেখুন, এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে 'কোরোজিয়ো'র জীবনের ঘটনার একটা তালিকা আমাকে তৈরী ক'রে দিন্‌না!"

তুমি কি ভেবেছো, কেরানীটি তক্ষুনি বলবে, "আচ্ছা!" এবং বলেই তখুনি সেই কাজ করতে বসবে?

আমি আমার জীবন তোমার কাছে বাঁধা রেখে বলতে পারি, যে, সে তা করবেনা! যেই তুমি তাকে অনুরোধ করলে, অমনি সে মাথা চুলকে নিয়ে—যা-হোক্ একটা না একটা প্রশ্ন করবে—

···"তিনি কে? কোন্ এন্‌সাইক্লোপিডিয়া?···এন্‌সাইক্লোপিডিয়াটা কোথায়? ···আমি কি এরই জন্যে এখানে খাটতে এসেছি?···কার কথা বললেন, বিসমার্ক নয় তো?···তিনি কি মারা গিয়েছেন?···এখনই দিতে হবে? একটু পরে দিলে হবেনা?···বইটা আপনার এখানে এনে দেবো?"

তারপর এইসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যখন তাকে বুঝিয়ে দিলে যে, কি ভাবে খবরটা কোথা থেকে কখন বার করতে হবে, সে তোমার কাছ থেকে চলে গিয়ে আর-পাঁচজন কেরানীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে, "আচ্ছা, 'কোরোজিয়ো' কোথায় খুঁজে পাবো বলো তো?" তারপর কিছুক্ষণ পরে ঘুরে এসে বলবে, "ও নামের কোনো লোক নেই।"

তোমার যদি বুদ্ধি-বিবেচনা থাকে, তুমি আর তাকে বলবেনা যে, তুমি 'K'এর মধ্যে খুঁজেছো, ও নামটা 'Q'র মধ্যে পাবে।

তার বদলে একটু হেসে তোমার বলা উচিত, "আচ্ছা, তাই হবে।"

এবং তারপর উঠে নিজে গিয়ে দেখে আসবে। একবার একটা খুব বড় কারখানায় গিয়েছিলাম। কারখানার প্রধান কর্ম্মচারী আমাকে ঘুরিয়ে নিয়ে কারখানা দেখিয়ে বলেছিলেন, 'ঐ যে লোকটি দেখছেন, খাতাপত্র নিয়ে হিসেব করছে, ও বেশ ভালো একজন একাউনটেণ্ট। ওকে শহরে কোনো দরকারে পাঠালে অনায়াসেই সে-কাজ ক'রে ফিরে আসতে পারে বটে, কিন্তু পথে যত আড্ডাখানা পড়বে, এক-একবার প্রত্যেকটাতে ঢুকবে! তারপর যখন আড্ডা দিয়ে ফিরে আসে, তখন যে-কাজের জন্যে ওকে পাঠানো হয়েছিল, তার কথা আর ওর মনেই থাকেনা।

দারিদ্র্যের মধ্যে কোনো গৌরব নেই। ছেঁড়া-জামা—দয়ার মন্দিরের প্রবেশ-পত্র নয়। সব মালিকই নিষ্ঠুর, বা কঠোর নয়, বা, সব শ্রমিকই ধার্ম্মিক, চরিত্রশীল নয়। আমি আমার পাশে সেই লোককে এনে বসাবো, যাকে জানি, আমার অসাক্ষাতেও সে সমান দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছে, যেমনটি সে করে যখন আমি তার সামনে থাকি। এবং চাই সেই লোককে, যখন তাকে চিঠি দিয়ে বলা হবে—গার্সিয়াকে দিয়ে এসো, তখন প্রত্যুত্তরে যে-নির্ব্বোধ প্রশ্ন তুলবেনা, যে, তার আর গার্সিয়ার মাঝখানে দায়িত্ব সম্পাদন করা ছাড়া আর কিছু আছে।

সমস্ত সভ্যতা তারস্বরে ডাকছে তাকেই, যে নিয়ে যেতে পারবে গার্সিয়ার এই চিঠি।

সে যখনই দেখা দেবে, সে যা চাইবে, তখনই সে তা পাবে। প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক নগর, প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক অফিস, প্রত্যেক শহরের প্রত্যেক কারখানা, প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক মাঠ তাকে চায়—তাকেই শুধু চায়।

জগতে আজ সেই লোকের বড় অভাব, যে চিঠি নিয়ে যেতে পারে, গার্সিয়ার কাছে।

অদৃশ্য প্রাণী জগৎ

একলা ঘরে তুমি ব'সে আছো। চাবদিকে কেউ কোথাও নেই। তুমি নিশ্চযই ভাবছো, ঘবে তুমি একলা ব'সে আছো—আব কোনো প্রাণী সেখানে নেই। কিন্তু সেই একলা-ঘবে হযতো তখন লক্ষ-লক্ষ প্রাণী ঠিক তোমাবই মতন নিশ্চিন্তে অবস্থান কবছে। একটা-আধটা প্রাণী নয, লক্ষ-লক্ষ প্রাণী তোমাকে ঘিবে সেই ঘবে ঘুরছে, ফিরছে, তাদেব বাসনা ও শক্তিঅনুযায়ী চলা-ফেরা করছে। সূর্য্যের যে-আলোটুকু জানলাব ফাঁক দিযে তোমাব গাযে এসে পড়েছে, তাতেই হয়তো লক্ষ-লক্ষ প্রাণী বিচরণ করছে! জগতেব কোনোখানেই তুমি একলা নও।

"লক্ষ-লক্ষ প্রাণী আমাব ঘবেব মধ্যে যে বিচবণ কবছে, কৈ, তাদের তো দেখতে পাইনা?" শুধু-চোখে তাদেব দেখা যাযনা। এবং শুধু-চোখে তাদেব দেখা যাযনা

ব'লে মনে কোরোনা যে তারা নেই। এই যে বাতাস বয়ে চলেছে, এই যে জলের গেলাস তোমার সামনে রয়েছে, এই জানলায় ঠিক যেখানটিতে হাত দিয়ে তুমি ব'সে আছো, সর্ব্বত্র সেইসব প্রাণীরা ন'ড়ে-চ'ড়ে বেড়াচ্ছে। এমন কি, মরু-প্রদেশের সেই চির তুহিনের মধ্যেও তাদের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

ইংরেজীতে এদের অনেক নাম, Microbes, Bacteria, Germs ইত্যাদি। সাধারণতঃ এদের Germs বলা হয়। বিখ্যাত ফরাসী-বৈজ্ঞানিক পাস্তুর গবেষণা ক'রে সর্ব্বপ্রথম দেখেছিলেন যে, এইসব দৃষ্টির অগোচর জীবাণুদের মধ্যে কোনো-কোনো শ্রেণীর প্রাণীই আমাদের বহু ব্যাধির জন্যে দায়ী। তাদের নাম তিনি দিয়েছিলেন; Microbes. আসলে Microbes মানে হলো—অতিক্ষুদ্র জীবিত প্রাণী।

এই সমস্ত জীবাণু এত ছোট যে, শুধু চোখে এদের দেখা যায়না। যতদিন না অনুবীক্ষণ-যন্ত্র তৈরী হয়েছিল, ততদিন পর্য্যন্ত এদের অস্তিত্বের কোনো সংবাদই মানুষ জানতোনা। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে এইসব জীবাণুর দল অদৃশ্য থেকে মানুষের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে মিশে, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে প্রভাব বিস্তার করেছে—তার জীবন-মৃত্যুর সাক্ষাৎ কারণ স্বরূপ তার পাশে-পাশে চলে এসেছে—তবুও মানুষ এদের অস্তিত্বের কথাই জানতে পারেনি। অতীত ইতিহাসে বড়-বড় মড়কের কথা আমরা পড়ি, হাজারে-হাজারে লোক এক-এক মড়কে উচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে, ভীত হয়ে মানুষ মন্দিরে পূজো দিয়েছে, গির্জ্জেয়-গির্জ্জেয় উপাসনা করেছে রোগ-শান্তির জন্যে, ভেবেছে—তাদের কোনো পাপের জন্যেই ভগবান স্বয়ং এই ব্যাধি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ভগবান এই-সব ব্যাধি পাঠিয়ে দিয়েছেন, মানুষের পাপের শাস্তি-স্বরূপ কিনা তা কেউ-ই বলতে পারেনা। তবে বৈজ্ঞানিকেরা বহুদিন ধ'রে গবেষণা ক'রে দেখলেন যে, ব্যাধি যিনিই পাঠিয়ে দিননা কেন, মানুষের দেহে ব্যাধি প্রকট হয় সেইসব দৃষ্টির অগোচর জীবাণুদের আশ্রয় ক'রে। জীবাণুরাই এই জগতে মড়ক এবং মহামারী এনেছে। আজ নানা বৈজ্ঞানিক-অস্ত্রের সাহায্যে মানুষ সর্ব্বদাই সতর্ক হয়ে আছে, যাতে অতর্কিতে এই অদৃশ্য শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত না হতে পাবে।

শুধু শত্রু নয়। এত-বড় ভয়ানক শত্রু মানুষের আর নেই। এক-একটা গ্রামকে যারা শ্মশানে পরিণত করার শক্তি রাখে, তাদের যদি আবার চোখে না দেখা যায়, তাহ'লে যে কি ভয়ানক অবস্থা হয়, তা আমরা মড়কের সময় বুঝতে পারি। এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবাণুদের জন্যেই সমস্ত মনুষ্য-সমাজ মাঝে-মাঝে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে!

শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করতে হ'লে, তার অস্তিত্বের সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম জ্ঞান সংগ্রহ করা প্রয়োজন। তাকে দেখতে কেমন, সে কিভাবে থাকে, কোথায় থাকে, কি খেয়ে বাঁচে, কিভাবে মরে, ইত্যাদি সমস্ত খবর তখনই নেওয়া সম্ভব হতে পারে যখন তাকে দৃষ্টি-সীমার মধ্যে আনা যায়। যতদিন না অণুবীক্ষণ-যন্ত্র তৈরী হয়েছিল, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষের অদৃশ্য থেকে এরা পরম নিশ্চিন্ত মনে মানব-সমাজে রোগ-শোকের বীজ ছড়িয়ে চলেছিল। অবশ্য এখানে ব'লে রাখা দরকার যে, সব জীবাণুই রোগবহ অথবা মানুষের শত্রু নয়; মানুষের পরম মিত্র স্বরূপ বহু জীবাণুও আছে, তাদের কথা পরে বলছি।

জগতে সর্ব্বপ্রথম যে মানুষটি এইসব অদৃশ্য প্রাণীদের সাক্ষাৎ লাভ করবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করেন, তাঁর নাম হল—লিউয়েনহুক। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে হলাণ্ডের ডেল্‌ফ্‌ট্‌ নগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের বংশগত ব্যবসা ছিল, ঝুড়ি-চুপড়ী ইত্যাদি তৈরী করা। বহু কৃতী পুরুষের মতন তাঁরও জীবন আরম্ভ হয় অতি সামান্য আয়োজনের মধ্যে। ডেল্‌ফ্‌ট্‌ নগরের টাউন-হলের তিনি দ্বার-রক্ষী ছিলেন। সারাক্ষণই তাঁকে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে হোতো। সময় কাটাবার জন্যে তিনি সাধারণ কাঁচ ঘ'সে-ঘ'সে তাকে আতস-কাঁচে, অর্থাৎ যে-কাঁচে ছোট জিনিস বড় দেখায়—পরিণত করবার চেষ্টা করতেন। এই ছিল তাঁর অবসর-বিনোদন। কুড়ি বছর ধ'রে এইভাবে কাঁচ ঘসতে-ঘসতে তাঁর মাথায় অণুবীক্ষণ-যন্ত্র তৈরী করবার কল্পনা জাগে। এবং তিনিই জগতে প্রথম কার্য্যকরী অণুবীক্ষণ-যন্ত্র তৈরী করেন। প্রথম যেদিন অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে তিনি সাধারণ দৃষ্টির অগোচর সেই রহস্যময় জগতের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন, সেদিন জীবনের সেই কল্পনাতীত বিচিত্র লীলা দেখে তিনি উন্মত্তের মতন

হয়ে গিয়েছিলেন। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের নতুন চোখ দিয়ে যেদিকে ফিরে চান, সেই দিকেই অদৃশ্যপূর্ব্ব নতুন জগৎ তাঁর চোখে পড়তে লাগলো। কল্পনার অতীত সব জিনিস তিনি দেখতে লাগলেন। জগতে তাঁর আগে এবং সেই সময় পর্য্যন্ত আর কেউ-ই সেই অপূর্ব্ব রহস্যলোক চোখে দ্যাখেননি। যেসব জিনিস চোখে দেখা যায়না, লিউয়েনহুক সেইসব জিনিস বেশ বড়-বড় ক'রে চোখের সামনে দেখতে পেলেন। মশার মাথা, মাছির পাখা, মৌমাছির হুল, ফড়িং-এর পা, এইসব অতি ছোট-ছোট জিনিস তিনি এত স্পষ্ট ও এত সূক্ষ্মভাবে দেখতে পেলেন যে, তার যথাযথ বর্ণনা যখন লিখতে লাগলেন তখন লোকে বিস্মিত হয়ে গেল। সেইসব সামান্য কীট-পতঙ্গের অবয়বের মধ্যে সে-কি অপূর্ব্ব গঠন-কৌশল! সঙ্গে-সঙ্গে কীট-পতঙ্গাদির বিষয়ে বহু অজ্ঞাত এবং ভ্রান্ত ধারণাও তিরোহিত হতে লাগলো।

সমগ্র জগতে তখন মাত্র সেই একটি অণুবীক্ষণ-যন্ত্র, এবং তার দর্শক একমাত্র—লিউয়েনহুক।

যন্ত্রটিকে তিনি নিজের অঙ্গের চেয়েও বেশী ভালোবাসতেন। কিছুদিন পরে দেখলেন যে, এক-একটা জিনিসকে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে দেখতে অনেক দিন সময় লাগে। প্রত্যেক জিনিসটিই তাঁর কাছে এমন রহস্যময় লাগতে লাগলো যে, সেটাকে তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে আবার সেই জায়গায় আর-একটা জিনিস দেখতে তাঁর মন সরছিলনা। সেইজন্যে তিনি আরও অনেক অণুবীক্ষণ-যন্ত্র তৈরী করতে লাগলেন। এবং প্রত্যেকটিতে আলাদা-আলাদা জিনিস দিনের পর দিন পর্য্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। এমনি দেখতে-দেখতে চেয়ে-দেখার এক অপূর্ব্ব নেশা তাঁকে পেয়ে বসলো।

আজও অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে যখন সাধারণ দৃষ্টির অতীত সেই অদৃশ্য-জগতের একটি কণাও চোখে পড়ে, বিস্ময়ে তখন আর চোখ ফেরাতে পারা যায়না। জীবাণু-তত্ত্ববিদ্ বন্ধুবর ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের (বিখ্যাত সাহিত্যিক "বনফুল") ল্যাবরেটরীতে বেড়াতে গিয়ে জীবনে সর্ব্বপ্রথম অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে সেই অদৃশ্য প্রাণী-জগতের সাক্ষাৎ দর্শন-লাভের সৌভাগ্য ঘটে।

সেদিনের বিস্ময় এবং আনন্দ, জীবনে ভোলবার নয়। সে-বিস্ময়, বর্ণনার অতীত! এক-ফোঁটা দ্রব্যের অতি সামান্য অংশে দেখি, হাজার-হাজার প্রাণী, প্রত্যেকটি আলাদা, ব্যাকুল গতিতে পরস্পর-পরস্পরকে পরিক্রমণ করছে, ঘুরছে, ফিরছে। তারপর ধীরে-ধীরে একটি-একটি ক'রে তারা মরতে লাগলো। কয়েক ঘণ্টার পর আবার সেই অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে দেখি এক বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রের-দৃশ্য! হাজার-হাজার সৈন্য ম'রে প'ড়ে রয়েছে, মৃতদেহের-স্তূপ কাটিয়ে অতি মন্থর-গতিতে তখনও একটি কি ছু'টি ধীরে-ধীরে, অতি ধীরে চলেছে। তারপরে তাদেরও গতি থেমে গেল। কয়েক ঘণ্টা আগে, জীবনে সেই প্রথম দেখলাম, একসঙ্গে এত প্রাণী আমারই দৃষ্টি-সীমার মধ্যে প্রাণ-স্পন্দনে নৃত্য ক'রে চলেছে—এত-বড় প্রাণীবহুল-জগৎ এর আগে একসঙ্গে আর কখনো দৃষ্টি-গোচর হয়নি। আবার কয়েক ঘণ্টা পরে জীবনে সেই প্রথম দেখলাম এক বিরাট শ্মশান। এত মৃতদেহ-ভরা শ্মশান জীবনে আর দেখিনি, দেখা সম্ভবও না।

আজ লিউয়েনহুকের কথা বলতে গিয়ে, নিতান্ত ব্যক্তিগত এই-কথাটি উল্লেখ করবার লোভ সম্বরণ করতে পারলামনা। কারণ, সে-বিস্ময়ের স্পন্দন জীবনে ভুলতে পারিনা। চরম-সৌভাগ্যের স্মৃতিস্বরূপ সেদিনটা স্বভাবতই চিহ্নিত হয়ে আছে।

লিউয়েনহুক তখন জগতে প্রথম একা সেই অদৃশ্য-জগৎ দেখেছিলেন। অপূর্ব্ব-সূক্ষ্ম ছিল তাঁর দৃষ্টিশক্তি এবং তিনি যেভাবে মানুষের অদেখা সেইসব জিনিসের বর্ণনা লিখতে আরম্ভ করলেন, তাতে সমস্ত জগৎ বিস্ময়ে সচকিত হয়ে উঠলো।

একদিন এক-ফোঁটা বৃষ্টির জল তিনি অণুবীক্ষণ সাহায্যে দেখতে গিয়ে ছাখেন, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! কোথা থেকে এই এক-ফোঁটা বৃষ্টির জলে এলো অসংখ্য সব প্রাণী! সেই প্রথম তিনি মাইক্রোবদের দেখা পেলেন। এতদিন পর্য্যন্ত তিনি যেসব জিনিস পর্য্যবেক্ষণ করছিলেন, সে-সব জিনিসের সকল সংবাদ মানুষের জানা না থাকলেও, সে-জিনিসগুলির সংবাদ মানুষের অজানা ছিলনা। কিন্তু এবার সহসা

তিনি এক সম্পূর্ণ নতুন জগতের সন্ধান পেলেন। নানা রকমের জিনিস পর্য্যবেক্ষণ করেন, আর ছাখেন, এ কি বিরাট প্রাণীময়-জগৎ আমাদের পরিব্যাপ্ত ক'রে রয়েছে!

সেইসময় পণ্ডিত লোকেরা ল্যাটিন-ভাষায় লিখতেন। লিউয়েনহুক ল্যাটিন-ভাষা জানতেননা। তিনি তাঁর মাতৃ-ভাষাতেই ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত রয়েল-সোসাইটিতে এই আবিষ্কার সম্পর্কে চিঠি লিখতে লাগলেন। তাঁর এই সংবাদে সমস্ত বৈজ্ঞানিক-মহল সচকিত হয়ে উঠলো;

কিন্তু না দেখা পর্য্যন্ত কেউই এ-কথা বিশ্বাস করতে পারলেননা।

এক-ফোঁটা জলে হাজার-হাজার প্রাণী রীতিমত বেগে ঘুরে বেড়াচ্ছে! সেকি? এ কি হতে পারে?

রয়েল-সোসাইটি দু'জন বড় বৈজ্ঞানিককে তাঁর কাছে পাঠালেন, কিন্তু তাঁর লেন্‌স তৈরী করবার কায়দা তিনি কিছুতেই তাঁদের জানালেননা। লিউয়েনহুক তাঁর অণুবীক্ষণ-যন্ত্রটি কাউকে ছুঁতে পর্য্যন্ত দিতেননা। তাঁর সেই যন্ত্রাগারে কৌতূহলাবিষ্ট হয়ে পিটার-দি-গ্রেট, ইংলণ্ডের রাণী, অদৃশ্য-জগতের স্বরূপ দেখতে এসেছেন, কিন্তু তিনি কাউকে তাঁর যন্ত্র ব্যবহার করতে দেননি!

লিউয়েনহুক ৯০ বছর বয়সে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর বৈজ্ঞানিক-মহলে এই নবাবিষ্কৃত জীবাণু-জগৎ সম্বন্ধে কৌতূহল ধীরে-ধীরে কমে এলো, যদিও তখন দেশে-দেশে অণুবীক্ষণ-যন্ত্র তৈরী হতে আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। বৈজ্ঞানিকরা তখন কল্পনাও করতে পারেননি যে, এইসব অদৃশ্য-প্রাণীদের সঙ্গে মানব-জীবনের কোনো গূঢ় সম্পর্ক থাকতে পারে। সেইজন্যে সেদিকে তাঁদের অনুসন্ধিৎসা বিশেষ প্রকট হয়ে ওঠেনি!

যে-বছর লিউয়েনহুক মারা যান, তার দু'বছর পরে ইতালীতে একজন জন্মগ্রহণ করলেন, যিনি আবার দৃষ্টির অগোচরে সব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীদের নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন।

তাঁর নাম হলো—স্পালান্‌জানি।

একটা জিনিস নিশ্চয়ই তোমরা লক্ষ্য করেছো। ধরো, একটা ইঁদুর ম'রে প'ড়ে রয়েছে। কিছুক্ষণ বাদে দেখলে যে, সেই ইঁদুরের গায়ে কোথা থেকে অসংখ্য পিঁপড়ে পোকা-মাকড় সব জমা হয়েছে। স্বভাবতই মনে এই প্রশ্ন জাগে, হঠাৎ এইসব পোকা-মাকড় কোথা থেকে এলো ?

—লিউয়েনহুক—

আগে লোকের ধারণা ছিল যে, আপনা থেকেই, কিম্বা কোনো প্রাণীর মৃতদেহ থেকে হঠাৎ প্রাণী জন্মগ্রহণ করতে পারে। এই বিশ্বাসকে ইংরেজীতে বলে, **Spontaneous generation,** বাংলায় আমরা বলবো, 'স্বতো-জনন'। অর্থাৎ তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, অজৈব পদার্থ থেকে জীবের উৎপত্তি হতে পারে। এবং এই ব্যাপার সম্বন্ধে আগেকার বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও নানারকমের অদ্ভুত ধারণা সব প্রচলিত ছিল। এরিষ্টটগের মতন পণ্ডিত লোকও লিখে গিয়েছেন যে, শুকনো কাপড় যদি অনেকক্ষণ ভিজে অবস্থায় থাকে, কিম্বা ভিজে কাপড় যদি শুকনো করা হয়, তাহ'লে সেই ব্যাপার থেকে জীবোৎপত্তি হতে পারে। আর-একজন জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক প্রচার করলেন যে, একটা কলসীতে কিছু গম রেখে তার ভেতর ময়লা-ন্যাকড়া ঠেসে একুশ দিন রাখলে, গমগুলো স্ত্রী-পুরুষ উভয়-জাতীয় ইঁদুরে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ফাদার নিড্‌হাম ব'লে একজন পাদ্রী-বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ক'রে এই স্বতোজননবাদকেই প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করছিলেন। ইতালী থেকে স্পালান্‌জানি

তাঁর প্রতিবাদ করলেন, এবং তিনিই এই ভ্রান্ত-ধারণা দূর ক'রে এই তথ্য প্রচার করলেন যে, যেখানে জীবন নেই, সেখান থেকে জীবনের উদ্ভব হতে পারেনা। জীবাণুরা কি ক'রে আপনা থেকে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে ক্রমশ সংখ্যায় বর্দ্ধিত হয়, সে-কথাও তিনিই প্রথম প্রচার করেন। কিন্তু 'স্বতোজনন' সম্বন্ধে চরম-প্রমাণ, স্পালানজানিও দিয়ে যেতে পারেননি। একশ্রেণীর জীবাণু, দৃষ্টির অন্তরালে থেকে তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে দিচ্ছিলো। লুইপাস্ত্যর এসে সেই নতুন ধরনের জীবাণু, যাকে তাপের প্রভাবেও বিনষ্ট করা যায়না, তার সন্ধান বার ক'রে; পরে স্বতোজননবাদের ভ্রান্তি দূর করেন।

স্পালানজানির মৃত্যুর পর আবার জীবাণু-তত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেল। তখন বাষ্প আর বিদ্যুৎ নিয়ে দেশ-দেশান্তরে বৈজ্ঞানিকরা ব্যস্ত। বাষ্প আর বিদ্যুতের মায়া-স্পর্শে তখন জগতে যাদুর খেলা চলেছে! লুইপাস্ত্যর এসে জীবাণু-তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিক-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রে বিজ্ঞান-জগতে যুগান্তর নিয়ে এলেন।

স্পালানজানির মৃত্যুর ৩২ বছর পরে ফ্রান্সের এক সামান্য পল্লীতে, ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর, লুইপাস্ত্যর জন্মগ্রহণ করেন। লুইপাস্ত্যরের জন্মগ্রহণ করার সঙ্গে-সঙ্গে মানব-সভ্যতায় একটা নতুন অধ্যায়ের সংযোগ হয়ে গেল। যে অদৃশ্য শত্রু—মানুষের দৃষ্টি এবং বুদ্ধির সীমার বাইরে থেকে এতকাল ধ'রে নিঃশব্দে মানুষের জীবনকে পদে-পদে ব্যাহত ক'রে এসেছে, লুইপাস্ত্যর সেই শত্রুর বিরুদ্ধে সমস্ত মানব-সভ্যতার চেতনাকে জাগ্রত ক'রে দিয়ে যান এবং তাঁরই অসামান্য বিজ্ঞান-প্রতিভায় সাধনায়, জগতে জীবাণু-তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

তিনি প্রথমে রসায়ন-বিদ্যা চর্চ্চা করতেন, এবং রাসায়নিক হিসাবেই তিনি প্রথম বৈজ্ঞানিক-মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রথম-জীবনে জীবাণু সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ কোনো কৌতূহল ছিলনা।

প্রথমে স্ফটিকের দানা নিয়ে তিনি গবেষণা আরম্ভ করেন। তারপর হঠাৎ একটা ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি সেই অদৃশ্য প্রাণীজগতের উপর এসে পড়লো।

সেইসময় রাসায়নিক হিসাবে তিনি এতদূর কৃতিত্ব অর্জ্জন করেন যে, ৩২ বছর বয়সেই তিনি লিলি নগরে বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীর অধ্যক্ষ হন। বিট, গম এবং শর্করা থেকে গাঁজন-ক্রিয়া দ্বারা সুরাসার তৈরী করার জন্যে এই প্রদেশ বিখ্যাত।

হঠাৎ বিশেষ কি কারণে, যাঁরা এই সুরাসার অর্থাৎ এ্যাল্‌কোহল্ তৈরী করার ব্যবসায় করতেন, তাঁরা দেখলেন, যে-পাত্রে তাঁরা সুরাসার তৈরী করছিলেন, সেই পাত্র ব্যবহার করলেই, সুরা ট'কে গিয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে তাঁদের বহু টাকা অনবরত ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে। তখন তাঁরা এর কারণ নির্ণয় করবার জন্যে পাস্তুরকে আমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে এলেন। তিনি এসে বহু পরীক্ষার পর দেখলেন, এক-রকমের অদৃশ্য প্রাণী, তারা গোপনে এক-রকমের এসিড উৎপন্ন ক'রে মানুষের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে দিচ্ছে। তিনি তাদের নাম দিলেন, ল্যাক্‌টিক্ এসিড ব্যাক্‌টিরিয়া (ব্যাক্‌টিরিয়া, জীবাণুদেরই আর-একটি নাম)। জীবাণুর সঙ্গে পাস্তুরের সেই হলো প্রথম পরিচয়।

এই ব্যাক্‌টিরিয়ার খবর পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে পাস্তুরের ধারণা হলো যে, নিশ্চয়ই আরও এই ধরনের বিভিন্ন রকমের জীবাণু আছে, যারা ঠিক এমনি দৃষ্টির অগোচর থেকে মানুষের ভয়াবহ সব ক্ষতি করছে। কে জানে তাদের কি চরিত্র, কে জানেই-বা তাদের কি শক্তি!

তিনি ছিলেন রাসায়নিক। জীব-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁকে নতুন ক'রে পড়াশোনা আরম্ভ করতে হলো। তাঁর জীবনের এই অধ্যায়ে যে-নিষ্ঠা, যে-একাগ্রতা, যে-পরিশ্রম করবার অসাধারণ শক্তির পরিচয় আমরা পাই, তা সত্যই অনন্যসাধারণ। শুধু যুগান্তকারী আবিষ্কারক ব'লে নয়, জগতে আদর্শ-চরিত্র হিসাবেও পাস্তুরের নাম চিরকাল জগৎ-বরেণ্য হয়ে থাকবে। লোককে আমরা রহস্য করি, কিন্তু পাস্তুর সত্যিই তাঁর নিজের বিয়ের দিন ভুলে গিয়েছিলেন! নিমন্ত্রিত বন্ধুরা গির্জ্জেয় এসে ছাখেন, পাস্তুরের খোঁজ নেই। চারদিকে খুঁজতে-খুঁজতে দেখা গেল যে, তিনি তখন তাঁর ল্যাবরেটরীতে একমনে গবেষণা করছেন!

স্পালানজানির অসমাপ্ত কাজ তিনি সম্পূর্ণ করলেন। তিনি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করলেন যে, আপনা থেকে, শূন্য হতে জীবাণু জন্মগ্রহণ করতে পারেনা। একরকম জীবাণু আছে, যাদের তাপের প্রভাবে বিনষ্ট করা যায়না। এই জীবাণুগুলি আগেকার সমস্ত বৈজ্ঞানিক-পরীক্ষায় বিদ্যমান থেকে, স্বতোজননবাদের সম্বন্ধে বিতর্ককে ঘোরালো ক'রে তুলেছিল। তিনি দেখালেন যে—জল, বাতাস, ধূলো, ময়লা এইসব জিনিসকে আশ্রয় ক'রে নিত্য এইসব দৃষ্টির আগোচর জীবাণুর দল এক জিনিস থেকে আর-এক জিনিসে যাতায়াত করছে, এক মানুষের দেহ থেকে আর-এক মানুষের দেহে যাচ্ছে। সেই দিন থেকে চিকিৎসা-জগতে এক নব-যুগের সূচনা হলো। এবং তার আদি প্রবর্ত্তক হলেন—লুইপাস্তুর।

সেইসময় অস্ত্র-চিকিৎসার নামে লোকে আতঙ্কিত হয়ে উঠতো। হাসপাতালে লোকে আসতে চাইতোনা। তার কারণ, অস্ত্র-চিকিৎসার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষতস্থান দূষিত হয়ে উঠতো এবং তার ফলে হতভাগ্য রোগীকে যম-যন্ত্রণা ভোগ ক'রে মরতে হতো। ক্ষত ধোয়াবার জলে, হাতের আঙুলে, বাতাসে···যে-ছুরি ব্যবহার করা হচ্ছে, তারই ডগায় যে অসংখ্য জীবাণু রয়েছে, তারা গিয়ে সেই ক্ষতস্থানকে দূষিত ক'রে দিচ্ছে, এ ব্যাপার মানুষ—পাস্তুরের আবিষ্কারের আগে ভাবতেই পারেনি।

পাস্তুর যখন ফ্রান্সে জীবাণু সম্পর্কে তাঁর যুগান্তকারী গবেষণা করছিলেন, সেইসময় ইংলণ্ডে 'লিষ্টার' নামে একজন ডাক্তার দিনের পর দিন রোগীদের সেই অসহ্য যন্ত্রণা দেখে ব্যাকুল ভাবে তার প্রতিকারের পথ খুঁজছিলেন। পাস্তুরের আবিষ্কার তাঁর অন্ধকার পথে সহসা আলো জ্বেলে দিলো। লিষ্টার স্থির করলেন, এইসব জীবাণুদের সংস্পর্শ থেকে যদি ক্ষতস্থানটি সংরক্ষণ করা যায়, তাহ'লে আর ক্ষত দূষিত হতে পারেনা। এবং এইভাবে লিষ্টার অস্ত্র-চিকিৎসার ব্যাপারে যুগান্তর নিয়ে এলেন। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো, অস্ত্র-চিকিৎসার সময় ডাক্তাররা কিরকম সতর্কতার সঙ্গে—যে-সব জিনিস ক্ষতস্থানের সংস্পর্শে আসবে, তাদের শোধন

ক'রে নেন। এই শোধন করার মানেই, সেইসব জিনিসে যদি কোনো জীবাণু থাকে, তা নষ্ট ক'রে ফেলা।

একজন বড় ইতিহাস-কার লিখেছেন যে, জগতে মানুষ যুদ্ধ ক'রে যত লোককে মেরে ফেলেছে, তার চেয়ে ঢের বেশী লোককে পাস্তুর আর লিস্টার বাঁচিয়েছেন।

জীবাণুদের নিয়ে পর্য্যবেক্ষণ করতে-করতে পাস্তুরের দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, মানুষের বহু মারাত্মক ব্যাধির মূলে রয়েছে এইসব জীবাণু। অথচ তিনি ডাক্তারী জানতেননা।

নিজের দু'জন ছাত্রের কাছে তিনি তা শিখতে আরম্ভ করলেন। সেইসময় ফ্রান্সে এবং জার্ম্মানীতে গৃহপালিত পশু এবং বিশেষ ক'রে ভেড়ার পালে ভয়াবহ মড়ক দেখা দিলো। এন্‌থ্রাক্স নামে পশু-রোগে দলে-দলে পশু মারা যেতে লাগলো। বহু ডাক্তার বহু ভাবে এই রোগ নিবারণ করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কেউই সফল হতে পারলেননা। পাস্তুর এইসম্পর্কে বহু গবেষণা ক'রে চিকিৎসা-জগতে আর-একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার করলেন। জীবাণুরা দেহে প্রবেশ ক'রে রক্তে একরকম বিষ সঞ্জাত করে। এই বিষই হলো আবার সেই রোগের ওষুধ। রুগ্ন দেহ থেকে এই বিষ সংগ্রহ ক'রে যদি প্রতিষেধক 'টিকা' দেওয়া যায়, তাহ'লে এই রোগের আক্রমণ থেকে পশুরা বাঁচতে পারে। অবশ্য তাঁর বহুপূর্ব্বে 'জেনার' এই সূত্র অনুসারেই মানুষের দেহের জন্যে বসন্তের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর উদ্ভাবিত এই চিকিৎসা-প্রণালীর ফলে জার্ম্মানী এবং ফ্রান্সের পশু-ব্যবসায়ীরা রক্ষা পেলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দশ বছরে ৩৪,০০০০০ ভেড়াকে এবং ৪,৩৮০০০ গৃহপালিত পশুকে প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার ফলে, মৃত্যুহার যথাক্রমে শতকরা ১টি এবং অন্যান্য পশুর পক্ষে হাজারে ৩টিতে এসে দাঁড়ায়।

তারপর তিনি আর-একটি মারাত্মক ব্যাধির চিকিৎসার দিকে দৃষ্টি দিলেন। ক্ষিপ্ত পশুর দংশনে 'জলাতঙ্ক' রোগের চিকিৎসারও তিনি প্রবর্ত্তক। আজ দেশে-দেশে

পাস্তুর চিকিৎসাশালা স্থাপিত হয়েছে এবং প্রতি বছরে হাজার-হাজার রোগী তাঁর উদ্ভাবিত প্রণালী অনুসাবে এই ভয়াবহ বোগেব কবল থেকে মুক্তি লাভ করছে। এই চিকিৎসা-প্রণালী আবিষ্কাব ক'রে প্রথম যে বালকটির তিনি চিকিৎসা করেন, সেই ঘটনাকে স্মরণীয় ক'বে বাখবার জন্যে কুকুরদষ্ট বালকটির একটি প্রস্তরমূর্ত্তি নির্ম্মিত হয়েছে ফ্রান্সে।

পাস্তুরের সময় থেকেই জীবাণু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-মহলে অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার আগ্রহ বিশেষ ভাবে দেখা যেতে লাগলো। একদিন সমুদ্র-পথে দেশ-দেশান্তর থেকে দুঃসাহসী নাবিকরা যেমন দলেব পব দল বেবিযেছিলেন—সমুদ্র-তরঙ্গের পরপারে অজানা সব দেশ আবিষ্কারের জন্যে, তেমনি পাস্তুবের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত দেশ-দেশান্তবে বৈজ্ঞানিকবা এক বিরাট অনির্দেশ্য অভিযানে, দলেব পব দল চলেছেন সেই অদৃশ্য প্রাণী-জগতের রহস্য ভেদ করার জন্যে।

জীবাণু-তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে পাস্তুবের পরেই বিখ্যাত জার্ম্মান ডাক্তাব 'কখ্'-এব নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

—পাস্তুব-

তিনিই এই তথ্য প্রচাব করেন যে, বিভিন্ন ব্যাধিব জন্য বিভিন্ন জীবাণু আছে। জীবাণুদের জীবন-প্রণালী সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত ও গবেষণা, উক্ত বিজ্ঞানের ভিত্তি দৃঢ়তর ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। কলেরা এবং টিউবার-কুলোসিস, এই দুই কালব্যাধির উৎপত্তি এবং প্রসারের কারণ মানুষের অজানা ছিল। কখ্-ই বহু গবেষণার পর দেখালেন যে, এই দুই ব্যাধির দুই বিভিন্ন জীবাণু আছে। এই জীবাণুরাই এই ব্যাধির প্রসারের কারণ। এই আবিষ্কাবের পর থেকে মানুষ এই দুই কাল-ব্যাধির চিকিৎসাব পথ খুঁজে পেয়েছে। প্লেগেব নাম শুনলে আজও হেন লোক নেই

যে, ভীত হয়ে ওঠেনা। লাখে-লাখে লোক এই রোগের আক্রমণে মরেছে, কিন্তু এই রোগের মূল কোথায় তা মানুষের জানা ছিলনা। 'ইয়ারসিন' এবং 'কিতাসাতু' নামে দু'জন জাপানী ডাক্তার এই রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন। এইভাবে জীবাণুদের চরিত্র অনুসন্ধান করতে-করতে মানুষ বহু কাল-ব্যাধির হাত থেকে উদ্ধারের পথ খুঁজে পেয়েছে। এবং সে অনুসন্ধান আজও পর্য্যন্ত চলছে।

আগেই বলেছি যে, সব জীবাণুই রোগবহ নয়। সব জীবাণুই মানুষের শত্রু নয়। যেমন এক-শ্রেণীর জীবাণু, মানুষের বহু মারাত্মক ব্যাধির প্রধানতম হেতু, তেমনি বহু জীবাণু আছে, যারা মানুষের—পৃথিবীর পরম বন্ধু। আমরা নিত্য যেসব দূষিত পচা-মরা জিনিস ফেলে দিই, এইসব জীবাণুরাই তাদের রূপান্তরিত ক'রে পৃথিবীর অতি প্রয়োজনীয় সারে পরিণত ক'রে চলেছে। সেইজন্যে বৈজ্ঞানিকেরা জীবাণুদের আর-একটি নাম দিয়েছেন, Scavengers of the world, পৃথিবীর যত ময়লা, তারাই প্রতি মুহূর্ত্তে পরিষ্কার করছে। দুধ থেকে যে মাখম তৈরী হয়, ঈয়েস্ট থেকে যে সুরাসার তৈরী হয়, তার মূলে এই জীবাণু।

জীবাণুরা যে পরিমাণ বৃদ্ধি লাভ করতে পারে, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। উপযুক্ত খাদ্য পেলে একটি জীবাণু বারো ঘণ্টার মধ্যে এক কোটি আশী লক্ষ জীবাণুতে পরিণত হতে পারে। যে-সমস্ত জীবাণু রোগবহ, তাদের একটি কি দুটি আমাদের দেহে একবার প্রবেশ লাভ করতে পারলে, দেহের মধ্যে অতি অল্প সময়ের ভিতর তারা লাখে-লাখে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যাদের চোখে দেখা যায়, তাদেরই মধ্যে ভালো-মন্দ বিচার করা দুরূহ···যাদের চোখে দেখা যায়না, তাদের মধ্যে ভালো-মন্দ বিচার করবার উপায় সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। তাই সাধারণ মানুষকে যতদূর সম্ভব জীবাণুদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ক'রে থাকতে হয়।

সিংহ

তোমরা লোহার খাঁচার মধ্যে বন্দী সিংহ নিশ্চয়ই দেখেছো। কিন্তু যাঁরা বনে গিয়ে তার রাজত্বের মধ্যে নির্ভয়ে কেশর ফুলিয়ে সিংহকে রাজত্ব করতে দেখেছেন, তাঁরা বলেন যে, সিংহের একটা অদ্ভুত রূপ আছে। এক-কথায় সে-রূপের বর্ণনা দেওয়া যায়না। ভয়ঙ্করের সঙ্গে সৌন্দর্য্যের···সৌন্দর্য্যের সঙ্গে শক্তির···শক্তির সঙ্গে বেগের···বেগের সঙ্গে তীব্রতার যোগাযোগ একমাত্র সিংহের মধ্যেই দেখা যায়। এতগুলো জিনিসকে মানিয়ে নেবার জন্যে সকলের উপর রয়েছে তার অপরূপ ভঙ্গী। এই ভঙ্গী আছে তার কেশরে, তার ক্ষীণ কটিতে, তার দেহের গতিতে, আর আছে তার কণ্ঠস্বরে! সে যে ভয়ঙ্কর, কণ্ঠস্বরের মধ্যে সে-কথা গোপন করবার কোনো চেষ্টা নেই। যখন সে গর্জ্জন করে, তখন তার সামনে যদি কোনো হতভাগ্য জীব এসে পড়ে, তাহ'লে সেই গর্জ্জনেই সে বিকল হয়ে যায়।

তার দাঁতে এত জোর যে, জ্যান্ত মোষের হাড় সে নিমেষে গুঁড়িয়ে ফ্যালে, একটা জেব্রার ঘাড় ছিঁড়ে ফ্যালে এক নিমেষে। তার থাবায় এত জোর যে, দুরন্ত বন্য ঘোড়াকে এক থাবায় সে নির্জীব ক'রে দিয়ে তার গায়ের চামড়া উপড়ে ফ্যালে। সে হাঁ করলে একটা পুরো মানুষের মাথা অনায়াসে তার মধ্যে চলে যায়, আর তার দেহের শক্তি এতদূর যে, একটা মোষকে মেরে, কাঁধে ক'রে ছোট-ছোট নদী অনায়াসে লাফিয়ে পার হয়ে যায়, এবং তার সেই গতির ক্ষিপ্রতা এতদূর যে, সেই সময়ের মধ্যে মনে হয় যেন একটা জীবন্ত বজ্র চলে গেল! ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে সবচেয়ে ভীষণতম অমন যে বিষধর অজগর সাপ·· সর্প-সিংহের যুদ্ধে শূরশ্রেষ্ঠ সিংহ তাকেও থাবার আঘাতে মেরে ফেলে সিংহনাদে অরণ্য কাঁপিয়ে তোলে। দলিত-ফণা ফণী, পশুরাজের পদাঘাতে পিষ্ট হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেও তার বিক্রম তাই ব'লে কম নয়। কিন্তু সে-কথা আজ নয়।

গর্ডন কামিঙ্ ব'লে একজন বিখ্যাত শিকারী, সিংহের গর্জ্জনের একটা বর্ণনা দিতে চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন, সিংহ সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথম বলতে হয়, তার অপূর্ব্ব গর্জ্জন সম্বন্ধে। এই গর্জ্জনের নানা রকম আছে। কখনো খুব নীচু অথচ গভীর আর্ত্তনাদের মতন শব্দ করে, এবং সে আর্ত্তনাদ পাঁচ-বার কিংবা ছ'বার পর-পর হয়, তার শেষে একটা গভীর শ্বাস ফ্যালে—একটু কাছে থাকলে মনে হয় যে, বনের বুক থেকে বুঝি সেই শ্বাস আসছে! আবার কখনো সহসা পাঁচ-ছ'বার উপরি-উপরি গভীর উচ্চ গর্জ্জন ক'রে ওঠে—এবং প্রত্যেক-বারের গর্জ্জন থেকে তার পরের-বারের গর্জ্জন গভীর থেকে গভীরতম হয়ে ওঠে। পাঁচ-বারের বার গর্জ্জনটা আবার কমে আসতে থাকে—তখন মনে-হয় যে, দূরে কোথাও বজ্রপাত হলো বুঝি! কখনো-কখনো তারা দল বেঁধে আবার একসঙ্গে গর্জ্জন করে। প্রথমে একটি সিংহ আরম্ভ করে, তারপর পাঁচ-ছ'টিতে মিলে সেই সুরকে তুলে নিয়ে গর্জ্জন ক'রে ওঠে, আবার তাদের গর্জ্জন মিলিয়ে যেতে-না-যেতে প্রথম দল ডেকে ওঠে—এইভাবে সমস্ত অরণ্যে এক ভয়াবহ শব্দের ঐক্যতান-বাদন চলতে থাকে।

সাধারণত রাত্রিতেই সিংহ গর্জ্জন করে। বনে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে তখন তাদের আর্ত্তনাদ স্বরু হয়! তারপর রাত্রি যত গভীর হয়, গর্জ্জন তত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে থাকে!

প্রকৃতিব আশ্চর্য্য নিয়ম অনুসারে এই ভয়ঙ্কর জীব—জীব-হত্যাই যার কাজ, তার বংশ-বৃদ্ধি বেশী হয়না। সাধারণত যে-সমস্ত পশু ফল-মূল-তৃণ খেয়ে বাস করে, মাংসাশী প্রাণীরা তাদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী সন্তান প্রসব করে। কিন্তু তাহ'লে কি হবে! সেই সূতিকাগাবেই এক অলক্ষ্য নিয়মের নির্দ্দেশে তার অধিকাংশই ম'রে যায়। নতুবা স্বয়ং পিতাই শাবকদের মেরে ফ্যালে! বেরালের বেলায় তোমরা বোধহয় এই ব্যাপাব লক্ষ্য ক'রে থাকবে। সন্তান হলেই বেরালের পিতা নিজের সন্তানকেই হত্যা করে। সেইজন্যে মাতাকে সর্ব্বদাই সজাগ থাকতে হয়।

সিংহেব বাজসিক-শক্তিতে মানুষ এতদূর মুগ্ধ হয় যে, মানুষের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁকে পুরুষসিংহ ব'লে সম্মান দেখানো হয়। কিন্তু এই উপমাটি বাইরের শক্তির প্রতি মানুষের মোহেরই একটা পরিচয়। যে-প্রাণী তার সমস্ত শক্তিকে শুধু জীবক্ষয় আর হত্যায় ব্যয়িত কবে এবং তাব ফলে প্রকৃতির নিয়মে ধীরে-ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, তার নামের সঙ্গে মানুষের নাম জুড়ে দেওয়া খুবই অসঙ্গত—যার ক্ষয় নেই, যে বেঁচে আছে নিয়ত নব-নব কীর্ত্তি আর সৃষ্টির দ্বারা। তবুও এটা আজ প্রথা হয়ে গিয়েছে।

মানুষ প্রথমে সিংহের মধ্যে অনেক রাজ-গুণ লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী শিকারীরা দেখেছেন যে, সেগুলির অনেকই ভুল সিদ্ধান্ত। একটা কথা প্রচলিত ছিল যে, সিংহ মরা-জন্তুর মাংস খায়না। কিন্তু অনেক বড়-বড় শিকারী দেখেছেন যে, পশুরাজ সেখানে অরণ্যের সাধারণ হিংস্র পশুদের মতনই লোভী।

আফ্রিকার ইংরেজরা যখন রাজ্যস্থাপন-কার্য্যে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন প্রতি পদে পশুরাজের সঙ্গে লড়াই ক'রে তাঁদের এগুতে হয়েছে, এবং কত লোককে যে সেইসময় সিংহের উদরে যেতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এই সময়কার আফ্রিকার

জঙ্গলের ইতিহাসে দুটি সিংহের অত্যাচারের কথা অক্ষয় হয়ে আছে। যখন 'উগণ্ডা-রেলওয়ে কোম্পানী' জঙ্গল কেটে রেল-লাইন বসাচ্ছিলো তখন এই দুটি সিংহের উৎপাতে কাজ করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। কুলীদের খাবারের জন্যে ছাগল-ভেড়া মজুত ক'রে রাখা হতো। প্রথমে সেই ছাগল-ভেড়াদের উপর সিংহ দুটির দৃষ্টি পড়লো।...রোজ রাত্রে এসে চারটে-পাঁচটা ক'রে মেরে নিয়ে যেতো। তারপর তাদের দৃষ্টি পড়লো মানুষের উপর। ক'মাস ধ'রে ক্রমাগত তারা দুটিতে নিঃশব্দে প্রতি রাত্রে তাঁবুর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে দুটি ক'রে লোক নিয়ে গিয়েছে! তাদের গুলী করবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে, রাতের পর রাত তারা তাদের খাদ্য সংগ্রহ ক'রে নিয়ে গিয়েছে। সেখানে যারা কাজ করতো তাদের মানসিক অবস্থার কথা একবার ভেবে ছাখো! প্রতিরাত্রে কোনো-না-কোনো তাঁবুতে সেই নৈশ-নীরবতার মধ্যে সহসা মানুষের শেষ ক্ষীণ আর্ত্তধ্বনি জেগে উঠতো—আবার নিঃশব্দে সেই আফ্রিকার আরণ্য-নির্জ্জনতার মধ্যে মিশে যেতো। অবশেষে অবস্থা এরকম হয়ে দাঁড়ালো যে, এক মাস সমস্ত কাজ বন্ধ ক'রে, শুধু সেই সিংহ দুটিকে হত্যা করবার জন্যে সকল শক্তি নিযুক্ত করা হলো। অবশেষে কর্নেল প্যাটারসন তাদের বধ করেন।

হিংস্র পশুরা যখন আক্রমণ করে—ধরো, কারুর হাতটা কামড়ে ধরলো, কি ছিঁড়ে নিয়ে গেল—তখন নাকি কোনো বেদনা বোধ হয়না। একবার দু-জন বিখ্যাত শিকারী, স্যার এডোয়ার্ড ব্রাডফোর্ড আর রুস্তম পাশা, নিমন্ত্রিত হয়ে এক-টেবিলে খেতে বসেছেন। স্যার ব্রাডফোর্ডের একখানা হাত নেই—রুস্তম পাশারও একখানা হাত নেই। একজনের হাত বাঘে, আর একজনের হাত ভাল্লুকে খেয়ে ফেলেছে! তাঁরা দু-জনেই সে-সময়ে বলেছিলেন যে, তাঁদের সে-সময় কোনো বেদনা বোধ হয়নি।

ডাঃ লিভিংষ্টোনের নাম তোমরা সকলেই শুনে থাকবে। এত-বড় পর্য্যটক ইদানীং আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেননি। আফ্রিকাকে তিনিই সভ্য-জগতের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেন। তাঁর জীবনে একটা বড় অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। একবার

তিনি একেবারে একটা সিংহের মুখে চলে গিয়েছিলেন—খুব বরাত-জোরে একটা কাফ্রী বর্শা দিয়ে সিংহটাকে বিঁধে ফেলাতে, সিংহটা লিভিংষ্টোনকে ছেড়ে, কাফ্রীটাকে আক্রমণ করলো। পরে লিভিংষ্টোন, সিংহের মুখে থাকার সময়ের অভিজ্ঞতার একটা বিবরণ দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন যে, "সিংহটা যখন প্রথম আক্রমণ করলো, তখন এমন একটা শক্ Shock লাগলো যে, তাঁর সমস্ত দেহ অবশ হয়ে গেল। বেরালে যখন ইঁদুরকে ধ'রে প্রথম ঝাঁকানি দেয়, তখন বোধহয় ইঁদুরের এই রকম সব-অঙ্গ অবশ হয়ে যায়। তারপর কেমন একটা অচৈতন্য ভাব এলো—সেই অচৈতন্য ভাবের মধ্যে কি ঘটেছে সবই বুঝতে পারছি, অথচ কোনো বেদনা বা ভয়ের চিহ্ন তখন নেই। সমস্ত ভয় যেন তখন কোথায় মিলিয়ে গেল!"

এ বড় দুর্মূল্য অভিজ্ঞতা—কি বলো?

আফ্রিকার আলজেরিয়া প্রদেশে সিংহ খুব বেশী আছে। সেখানে তিন রকমের সিংহ দেখা যায়—একেবারে কালো রঙের, মেটে রঙের, আর ধূসর রঙের। এর মধ্যে, কালো রঙের সিংহ কম দেখা যায় এবং তারা দেখতে অপেক্ষাকৃত ছোট; কিন্তু বলিষ্ঠ সকলের চেয়ে। সাধারণত এরা শিকারের জন্যে ঘুরে বেড়ায়না। কোনো বনের মধ্যে একটা পাহাড়ের গুহায় একটা বাসা ঠিক ক'রে সেইখানেই ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর্য্যন্ত বসবাস করে। এরা লোকালয়-মুখী বড় একটা হয়না। সন্ধ্যাবেলায় বনের ধারেই ওত পেতে ব'সে থাকে; সামনের মাঠ থেকে, কিম্বা পাহাড়ের গা থেকে সন্ধ্যাবেলায় গরু-বাছুর যখন নামে, তখন একেবারে গোটা-পাঁচেক বধ ক'রে আহার এবং তৃষ্ণা দুই নিবারণ করে। গরু-বাছুরের রক্তেই এরা সাধারণত তৃষ্ণা নিবারণ করে। গ্রীষ্মকালে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার পড়তে বিলম্ব হয়, বনের পথের ধারে প্রায়ই এরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে, যদি কোনো হতভাগ্য-পথিক দেরী ক'রে সেই পথ দিয়ে ঘরে ফেরে। যাদের বরাতে সেই বনের-পথে সন্ধ্যা হয়ে যায়—তাদের জীবনে আর রাত্রি আসেনা। আর অন্য যে দু'রকম সিংহের কথা বললাম, তাদের দিন হলো আমাদের রাত্রি।

সন্ধ্যার অন্ধকার যেই প'ড়ে এলো, অমনি তারা বেরুলো। তারা অধিকাংশ সময় আবার একা বেরোয়না। সঙ্গে স্ত্রীকে নিয়ে চলে। স্বামী-স্ত্রীতে তখন আহারের অন্বেষণে সমস্ত অরণ্যকে কাঁপিয়ে তোলে। এবং যতক্ষণ না আহার পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ তাদের গর্জ্জনের বিরাম নেই। আলজেরিয়ায় যে-সমস্ত আরব থাকে—তারা রাত্রিবেলার এই সিংহনাদকে তাদের ভাষায় 'বজ্রের-ডাক' বলে। যদি কোনো দিন কোনো কারণে দিনেরবেলায় এদের চলা-ফেরা করতে হয়, তাহ'লে সে-সময় যে-প্রাণী তাদের সামনে পড়বে তার আর রক্ষে নেই! আলজিরিয়ায় একসময় সিংহের ভয়ানক উৎপাত ছিল। মরুভূমি-বাসী আরবরা এই সিংহের অত্যাচারে নিশিদিন সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতো। অবশেষে 'জুলি জেরার্ড' নামে বিখ্যাত ফরাসী সিংহ-শিকারী তাদের এই সিংহের আতঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করেন। সিংহ-শিকারী হিসেবে জুলি-জেরার্ডের নাম জগদ্বিখ্যাত। তাঁর মতন সাহসী খুব কম লোকই ছিল। যেখানে আরবরা বন্দুক নিয়ে দল-বল বেঁধে সিংহ-শিকারে যেতো, সেখানে জুলি-জেরার্ড একা যেতেন। সিংহের পায়ের-দাগ লক্ষ্য ক'রে, তার বিবরের কাছে গিয়ে জেরার্ড সিংহ বধ ক'রে এসেছেন।

সিংহের শেষ-জীবন বড় শোচনীয়। সমস্ত জীবন যে শুধু হত্যা ক'রেই এসেছে—প্রকৃতি তার উপর প্রতিশোধ নিতে কার্পণ্য করেনা। সিংহের শেষ-জীবন সম্বন্ধে একজন বিখ্যাত জার্ম্মান পশু-তত্ত্ববিদ্ যে সুন্দর চিত্র এঁকেছেন, এখানে তোমাদের তাই শোনাচ্ছি:

"সিংহকে পশুরাজ বলা হয়। কিন্তু যে-মানুষ সিংহকে এই নাম দিয়েছিল, সে মস্ত-বড় একটা ভুল করেছিল। যে রাজা, তার উচিত, তার রাজ্যবাসীর কল্যাণের জন্যে শক্তি ব্যয় করা। কিন্তু সিংহ শুধু অরণ্যবাসীদের হত্যা করেই তার শক্তি ব্যয় করে।

সেইজন্যে অরণ্যের আর-সব প্রাণী তাকে এড়িয়ে চলে। যখনি তার গর্জ্জন শোনে—তখনি তারা তাদের গর্ত্তে কেঁপে ওঠে! * * * তারপর আসে ধীরে-ধীরে

প্রকৃতির প্রতিশোধ। সিংহ যখন বৃদ্ধ হয়—তার দাঁত যায় প'ড়ে—দাঁতে তখন থাকেনা আর সেই জোর। থাবা হয়ে পড়ে শিথিল। সামনে দিয়ে বন্য ঘোড়া পুরো কদমে চলে যায়—সাহস হয়না আর তাকে আক্রমণ করতে। ঘোড়ার খুরকে তখন সিংহ ভয় করে—সিংহ তখন ভয় করে মোষের সিংকে। তখন তার নজর পড়ে অরণ্যের ক্ষুদ্র নিরীহ প্রাণীদের উপর—যাদের আত্মরক্ষার কোনো অস্ত্র নেই। এইসময় মানুষের উপরও তার বড় লোভ হয়। মানুষের খুরও নেই—সিংও নেই। তারপর যখন আরও বৃদ্ধ হয়, তখন ছাগল-ভেড়া ছেড়ে পশুরাজ সিংহকে—খরগোস অন্বেষণে বেরুতে হয। এবং তারও সামর্থ্য যখন থাকেনা, তখন প্রকৃতির কঠোর বিধানে সিংহকেও ঘাস খেতে হয়। তারপর একদিন পদচিহ্ন অনুসরণ ক'রে মানুষ স্বচ্ছন্দে তার বিবরে গিয়ে তাকে হত্যা ক'রে আসে।

জীবনে সিংহ কারুর উপকার করেনি। তার মৃত্যুর পরও তাকে দিয়ে কারুর কোনো উপকার হয়না। অসভ্য বন্য-মানুষরা সকলের মাংস খায়—কিন্তু সিংহের মাংস তারাও খায়না। তার চামড়াও কোনো কাজে লাগেনা। অসংখ্য তাতে ক্ষত-চিহ্ন! তার যৌবনের অত্যাচারের সব স্মৃতি-চিহ্ন! অরণ্যের ভীষণতম পশুকে হত্যা করতে পেরেছে—সেই গৌরবের চিহ্নস্বরূপ শুধু শিকারী মানুষ সেটাকে ঘরে টাঙিয়ে রাখে।”

———

হাতী

জগতে যতরকম প্রাণী আছে, তিমি-মাছ হলো তাদের সকলের চেয়ে বড়। সে এত ভারি যে, মাটির উপর বিচরণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সৃষ্টিকর্ত্তা তাকে জলচর করেছেন। কিন্তু স্থলচর প্রাণীদের মধ্যে হাতী হলো সবচেয়ে বড়। আফ্রিকা দেশের একটা হাতীর ওজন প্রায় সাড়ে-দু'টন, এবং উঁচুতে প্রায় বারো-ফুট পর্য্যন্ত হয়।

আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষে—এই দুই দেশে হাতী পাওয়া যায়। কিন্তু আফ্রিকার হাতীর সঙ্গে ভারতবর্ষের হাতীর অনেক তফাৎ আছে। আফ্রিকার হাতীর কান দুটো আমাদের দেশের হাতীর কানের চেয়ে ঢের বড়। যখনই কোনো বিপদের সম্ভাবনা তারা শুনতে পায়; তখনই কান দুটো খাড়া ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, মনে হয়, দু-দিকে দুটো বড় 'কুলো' কে যেন বেঁধে দিয়েছে। তা নাহ'লে, অন্য সময়

কান দুটো কাঁধের উপর ফেলে রাখে—সমস্ত কাঁধটা তাতে ঢাকা প'ড়ে যায়। আফ্রিকার হাতীদের মাথা আরও একটু গোল, চোখ দুটো আরও একটু বড়।

হাতীর শুঁড়ের ডগায় তোমরা লক্ষ্য ক'রে দেখো, আঙুলের মতন খানিকটা বেরিয়ে থাকে। আফ্রিকার হাতীর শুঁড়ের ডগায় দু-দিকে এইরকম দুটো আঙুল থাকে, কিন্তু আমাদের দেশের হাতীর সেই জায়গায় মাত্র একটা আঙুল থাকে। তারপর, তাদের শুঁড়ের গঠনেরও তফাৎ আছে। আফ্রিকার হাতীর শুঁড়ের উপর-দিকটা দেখতে খাঁজ কাটা-কাটা, মনে হয়, চাপ দিয়ে থাকের পর থাক বসিয়ে দেওয়া যায়। আফ্রিকার হাতীর গায়ের রঙ আরও একটু ঘন, গজ-দাঁত আরও একটু বড় এবং পেছনের পায়ে—চারটের বদলে তিনটে নখ থাকে। বৃটিশ-মিউজিয়ামে আফ্রিকা দেশের একটা হাতীর দাঁত আছে। সেটা লম্বায় ১০ফিট ২ইঞ্চি, এবং তার ওজন হচ্ছে, ২২৮পাউণ্ড। আফ্রিকার হাতীর সবচেয়ে বড় গজ-দাঁত যা দেখা গিয়েছে সেটা লম্বায় এক ইঞ্চি কম ১২ফিট।

আমাদের দেশে কোনো লোককে বিশেষ বোকা বলতে হ'লে সাধারণতঃ 'হস্তীমূর্খ' বলা হয়। কিন্তু কেন যে বোকা লোককে হাতীর সঙ্গে তুলনা করা হয় বলতে পারিনা। কারণ, হাতীর চেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী জগতে খুব কমই আছে। এক-শ্রেণীর বানর ছাড়া বন্য জীব-জন্তুর মধ্যে এত-বড় বুদ্ধিমান প্রাণী সমস্ত অরণ্য-জগতে নেই। বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে, হাতীর মস্তিষ্কের গঠন অপূর্ব্ব। পুরাকালে জগতে বহু অতিকায় জন্তু ঘুরে বেড়াতো, কিন্তু আজ তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, কারণ, তাদের দেহের সঙ্গে তাদের মস্তিষ্ক বেড়ে ওঠেনি। কিন্তু হাতীর দেহ যেমন বেড়ে উঠেছে, সেইসঙ্গে তার মস্তিষ্কও তেমনি বেড়ে উঠেছে। সেইজন্যে অত-বড় বৃহৎ দেহ নিয়ে সে আজও টিকে আছে।

বহু প্রাচীন যুগে মানুষ যখন সর্ব্বপ্রথম এই পৃথিবীতে আসে, তখন তার সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এই হাতী। হাজার-হাজার বছর আগেকার জগতের আদিম অধিবাসীদের আঁকা যে-সব ছবি পাহাড়ের গুহায় পাওয়া গিয়েছে, তার মধ্যে

হাতীর একটি আশ্চর্য্য ছবি আছে। স্পেনে 'পিন্‌ডাল-গুহা'য় এই ছবিটি পাথরের গায়ে আঁকা দেখতে পাওয়া যায়। আদিম চিত্রকর, 'হরতনের টেক্কা'র মতন একটা জিনিস এঁকে হাতীর হৃদয়ের অবস্থান বুঝিয়েছেন। ছবিটার বিশেষত্ব হলো এই যে, সেই অসভ্য আদিম চিত্রকর যে-জায়গাটাকে হৃদয়ের অবস্থান-ক্ষেত্র ব'লে নির্দ্দেশ করেছেন, আধুনিক দেহ-বিজ্ঞান অনুসারে ঠিক সেইখানেই হৃদয়ের অবস্থান হয়। আদিম-মানুষকে এতখানি অন্তরঙ্গ ভাবে তার প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে মিশতে হয়েছিল যে, তার নাড়ী-নক্ষত্র সমস্ত তার জানা হয়ে গিয়েছিল।

বৈজ্ঞানিকরা হাতীর আদিম-পুরুষদের নাম দিয়েছেন—মেরিথিরিয়াম্‌ (Moeritherium)। বর্ত্তমান হাতী আর মেরিথিরিয়াম্‌-এর মধ্যে আরও তিন ধরনের জন্তু জন্মেছে এবং মরেছে—তারপর এসেছে হাতী। এদের চেহারার সাদৃশ্য দেখেই বুঝতে পারা যায় যে, এরা সকলেই একই-বংশের প্রাণী।

এত-বড় জন্তু, কিন্তু তার চোখ দুটো দেখেছো কিরকম ছোট? শুধু দেখতে ছোট নয়, হাতীর দৃষ্টি-শক্তিও বড় কম। পঞ্চাশ গজের ওধারে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকলে, হাতী দেখতে পায়না—সেইজন্যে বন্য-হাতীর খুব কাছে ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে ফটো তোলা হয়। তবে আর-একটা কথা আছে। হাতীর দৃষ্টিশক্তি যেমন অদ্ভুত-রকমের কম, তার শ্রবণ এবং ঘ্রাণ-শক্তি কিন্তু তেমনি অদ্ভুত-রকমের বেশী। আধমাইল দূরে যদি মানুষ থাকে, তাহ'লে বাতাসে গন্ধ শুঁকে এরা তা বুঝতে পারে। সেইজন্যে, যেদিক থেকে হাওয়া বইছে তার উল্টোদিক থেকে কোনো লোক যদি একদল হাতীর একবারে পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়, তাহ'লে তারা কিছুই বুঝতে পারবেনা, কিন্তু যেদিক দিয়ে হাওয়া দিচ্ছে, সেদিক দিয়ে লুকিয়ে আসবার জো নেই। হাওয়ায় মানুষের দেহের গন্ধে তারা বুঝতে পারবে যে, সামনে মানুষ আছে। শ্রবণ-শক্তিও এদের খুব তীক্ষ্ণ। দূরে কোথাও বিপদের সম্ভাবনা হ'লে, বহুপূর্ব্বে এরা তার সংবাদ শুনতে পায়। কুলোর মতন দুটো কান খাড়া ক'রে বহুদূরের আওয়াজ এরা অনায়াসে শোনে।

হাতীর চেহারা দেখলেই মনে হয় যে, এর-দ্বারা কোনো কাজ করানো অসম্ভব। কিন্তু দেখতে ভারি হ'লে হবে কি, হাতীর গুণ অনেক। ঐ বিরাট দেহ নিয়ে হাতী অনায়াসে জলে সাঁতার দিয়ে চলে যেতে পারে; আবার থামের মতন পা নিয়ে অদ্ভুত কায়দায় অনায়াসে উঁচু পাহাড় বেয়ে চলে যায়! পাহাড়ের যে-সব ঢালু জায়গা দিয়ে মানুষ নামতে সাহস করেনা, সেই-সব জায়গা দিয়ে, বিজ্ঞ এঞ্জিনীয়ারের মতন মেপে-মেপে পা ফেলে সে অনায়াসে চলে আসে। হাতী যখন দলবদ্ধ হয়ে এক বন থেকে আর-এক বনে যাতায়াত করে, তখন তাদের দলের গতি-ছন্দের সঙ্গে, সৈন্যদের যাত্রার কোনো তফাৎ থাকেনা—এতখানি শৃঙ্খলা তারা বজায় রাখতে পারে।

সাধারণতঃ রাত্রিবেলায় তারা জলে খেলা করতে বেরোয়। বড়-বড় শিকারীরা বলেন যে, সে-দৃশ্য সত্যিই দেখবার মতন। দলবদ্ধ হয়ে তারা নিকটস্থ জলাশয়ের দিকে যাত্রা করে একেবারে নীরবে। একশো-টা হাতী আসছে, কিন্তু কোথাও একটু শব্দ নেই। এমনি নীরবে তারা চলতে পারে। জলাশয়ের কাছে একটা নিরাপদ জায়গায় প্রথমে সকলে মিলে জড় হয়, তারপর একজনকে আগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়—আশে-পাশে কোনো বিপদের সম্ভাবনা আছে কিনা দেখবার জন্যে। দল ছেড়ে সে তখন একলা অতি-সন্তর্পণে কান খাড়া ক'রে জলাশয়ের ধারে আসে এবং যদি বোঝে যে, বিপদের কোনো সম্ভাবনা নেই, তখন চীৎকার ক'রে ইঙ্গিত করে আসবার জন্যে। বনের মধ্যে থেকে সেই ইঙ্গিতের প্রত্যুত্তর আসে। তারপর তারা সকলে এসে জলে নামে।

এই চীৎকারের সাঙ্কেতিক-ভাষা ব্যবহার করে হাতীরা বিরাট বনের মধ্যে নির্ভয়ে বাস ক'রে। বনের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্য্যন্ত ডাক পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা তাদের আছে। যখন বনের সমস্ত হাতী একজায়গায় দলবদ্ধ হতে চায়, তখন এই ডাকের ইঙ্গিতে তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে দূর-দূরান্তর থেকে ঠিক একজায়গায় এসে জড় হয়।

শেখানো-হাতীকে দিয়ে মানুষ অনেক 'কসরত' দেখাতে পারে। হাতীর খেলা সার্কাসের একটা প্রধান-অঙ্গ। কিন্তু বুনো-অবস্থায় হাতীরা নিজেদের মধ্যে যে-সব কসরত করে, তাও কম অদ্ভুত নয়। 'স্যার এডওয়ার্ড টেনাণ্ট' একবার সিংহলে হাতী শিকার করতে বেরিয়েছিলেন। হঠাৎ বনের মধ্যে একটা গুণ্ডা-হাতীর দ্বারা তিনি আক্রান্ত হন। এই গুণ্ডা-হাতীর পরিচয় তোমাদের পরে বলছি। সামনে একটা প্রকাণ্ড গাছ পেয়ে, স্যার এডওয়ার্ড তাড়াতাড়ি কোনো রকমে গাছে উঠে প'ড়ে সে-যাত্রা বেঁচে গেলেন। কিন্তু ছ্যাখেন, হাতীটা অত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। শুঁড় দিয়ে গাছটাকে উপড়ে ফেলবার বার-বার চেষ্টা ক'রে যখন ব্যর্থ হলো তখন হঠাৎ ছ্যাখে, সামনে অনেকগুলো কাঠ প'ড়ে আছে। দেখে শুঁড়ে ক'রে একটার পর একটা কাঠ সাজিয়ে একটা উঁচু বেদী তৈরী ক'রে, সামনের ছুটো পায়ের উপর ভর দিয়ে উপরের বড় ডালটা ধরবার জন্যে শুঁড় এগিয়ে দিলো। স্যার এডওয়ার্ডের হাতে বন্দুক না থাকলে সে-যাত্রা আর তাঁর রক্ষা ছিলনা। গুলির আঘাতে জর্জ্জরিত হয়ে হাতীটা প'ড়ে গেল।

হাতী যদিও পোষ মানে, কিন্তু মানুষের সঙ্গে তার আদিম-শত্রুতার এখনো অবসান ঘটেনি। আফ্রিকার যে-অঞ্চলে বেশী হাতী থাকে, সে-অঞ্চলের লোকের সর্ব্বদাই আতঙ্কে দিন কাটে। শস্য-ক্ষেত্রে ফসল পেকে উঠেছে—এমন সময় কোথা থেকে একদল হাতী এসে সমস্ত ক্ষেত লণ্ড-ভণ্ড ক'রে দিয়ে চলে গেল। যা খাবার, তা পেট পুরে খেয়ে, অবশিষ্ট যা প'ড়ে রইলো তা সমস্ত নষ্ট ক'রে দিয়ে চলে যায়। সামনে যদি চাষাদের ঘর থাকে, সেটিকে পর্য্যন্ত ভূমিসাৎ ক'রে দিয়ে যায়। পায়ের তলার গঠনের জন্যে হাতী খুব নীরবে চলতে পারে। ক্ষেতে হয়তো আপনমনে চাষী কাজ করছে, হাতী কখন নীরবে পেছন দিক থেকে এসে পিঠে গজ-দাঁত বসিয়ে দিয়েছে—বোঝবারও সময় পাওয়া যায়না। রোডেসিয়াতে জঙ্গল কেটে যখন রেল-লাইন বসানো হয়, তখন এই হাতীর উৎপাতে কাজ একরকম বন্ধ ক'রে দিতে হয়েছিল। সাধারণ ভাবে সেখানে হুকুম জারী ক'রে দেওয়া হয় যে, হাতী দেখলেই যেন লোকে মেরে ফ্যালে।

সাধারণতঃ এই তো হোলো এদের চরিত্র। তার উপর এদের দলে প্রায়ই একজন ক'রে গুণ্ডা-হাতী থাকে। বদমায়েস গুণ্ডাদের মতন এরা প্রায়ই একলা ঘুরে বেড়ায়। এই গুণ্ডা-হাতীর মতন ভয়ঙ্কর-জীব সমস্ত অরণ্য-জগতে নেই বললেই চলে। তার সামনে পড়লে—কি মানুষ, কি জন্তু, কারুরই রক্ষা নেই।

—হাতী এসে সমস্ত ক্ষেত লণ্ড-ভণ্ড ক'রে দিয়ে চলে গেল—

হাতীর অত্যাচারে অস্থির হয়ে মাঝে-মাঝে আফ্রিকাতে হাতী বধ করবার জন্যে রীতিমত হুকুম-জারী করা হয়। কিন্তু তার ফলে দেখা গেল যে, আফ্রিকাতে হাতীর সংখ্যা ক্রমশ এমন ভাবে কমে আসছে যে, তাদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। সেইজন্যে অনেকে বলেছেন যে, এত-বড় শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান্ প্রাণী যদি বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহ'লে সেটা মানুষের পক্ষে চরম ক্ষতিকর হবে। ঘোড়া-গরুর মতন হাতীকে পোষ মানিয়ে মানুষের কাজে লাগানো যায়না কি?

তোমরা হয়তো জানোনা যে, হাতীকে শিক্ষা দেবার জন্যে বেলজিয়ান-কঙ্গোতে একটি কলেজ খোলা হয়েছে। সেখানে মানুষের নানারকম দরকারী কাজ সম্বন্ধে

হাতীকে শিক্ষা দেওয়া হয়। বুনো-হাতীকে মানুষ করতে হ'লে, মানুষের মতন তাকে ভালোবাসতে হয়। একান্ত সদয় ব্যবহার না পেলে হাতী কিছুতেই বশ মানেনা। কিন্তু যখন বশ মানে; যার হাত দিয়ে সে স্নেহ, যত্ন, ভালোবাসা পায়, তাকে বহু বর্ষ ধ'রে স্মরণে রাখে। ওয়ারেন হেষ্টিংসের একটা হাতী একবার বনে পালিয়ে যায়। হেষ্টিংস্ মনে করেন যে, মাহুতই বোধহয় গোপনে হাতীটাকে বেচেছে। তিনি মাহুতকে কঠোর শাস্তি দেন। এই ঘটনার পাঁচ বছর পরে একদিন সেই মাহুতকে নিয়ে বনে শিকার করতে গিয়ে, দৈবক্রমে সেই পালিয়ে-যাওয়া-হাতীটার সঙ্গেই দেখা হয়ে যায়। সঙ্কেত করতেই প্রত্যেক সঙ্কেতটির সে উত্তর দিলো, এবং আপনা-থেকে মাহুতের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বহুদিনের অদর্শনের পর অভিবাদন জানালো। পুরাকালে আমাদের বাংলাদেশে হাতীকে শিক্ষা দেবার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। 'হস্তী-চিকিৎসা' ব'লে আমাদের দেশে একটা বিশেষ চিকিৎসা-প্রণালী ছিল। 'পুলকাপ্য' ব'লে একজন ঋষি ছিলেন। তিনি হস্তী-চিকিৎসা সম্বন্ধে বই লেখেন। সে-বই এখনো প্রচলিত আছে।

হাতীর চরিত্রের একটা দিক অবিকল মানুষের মতন। মানুষের মতন সে প্রতিহিংসা-পরায়ণ, মানুষের মতন সে ঈর্ষান্বিত হয়, আবার মানুষেরই মতন মমতাশীল হতে পারে সে। বহু মাহুতের পরিবারে শিশু-পুত্রদের সে-ই রক্ষক এবং পরিচালক। সেই অতিকায় জন্তুর কাছে মানবী-মাতা নিরুদ্বিগ্ন-চিত্তে শিশু-সন্তানটিকে রেখে কাজ করতে যায়।

প্রাচীন রোমে সার্কাসের খুব প্রাধান্য ছিল। জন্তুদের দিয়ে নানা রকমের কসরত দেখানো তাদের উৎসবের অঙ্গ ছিল। রোমের এক প্রাচীন কাহিনীতে আমরা দেখতে পাই, যে, একবার এক সার্কাস-ওয়ালা, ভালো খেলা দেখাতে না পারার দরুণ তার হাতীর দলকে বেদম প্রহার করে। সেইদিন রাত্রিবেলায় সার্কাস-ওয়ালা বিস্মিত হয়ে গেল যে, হাতীরা আপনার মনে—দিনেরবেলায় যে-সব কায়দা দেখাতে পারেনি, সেগুলি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছে। 'হ্যানিবল্' যখন দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে

আল্পস্ পাহাড় পার হয়েছিলেন, সেই ঐতিহাসিক পর্ব্বত-যাত্রায় যেখানে মানুষ অপারগ হয়ে প'ড়ে গিয়েছিল, ৩৭টি হাতী সেইখানে তুষার মন্থন ক'রে তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে গিয়েছিল।

আমাদের এই পৃথিবীতে আসার বহু পূর্ব্বে সে এই পৃথিবীতে এসেছিল এবং আজও পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে। সাইবেরিয়ায় চির-তুহিনের মধ্যে লক্ষ বৎসর আগেকার কয়েকটি হাতীর পূর্ব্ব-পুরুষদের পাওয়া গিয়েছে। সেই চির-তুষারের মধ্যে বন্দী হয়ে—তারা লক্ষ বছর আগে ঠিক যেমনটি ছিল, অবিকৃত অবস্থায় ঠিক তেমনি ভাবেই আজও রয়ে গিয়েছে। তাদের লোমগুলি পর্য্যন্ত নষ্ট হয়নি—দেহের কোনো অংশে কোথাও বিন্দুমাত্র বিকৃতি ঘটেনি। পেটের মধ্যে লক্ষ বছর আগেকার-খাওয়া গাছের ডালটি পর্য্যন্ত অজীর্ণ অবস্থায় রয়ে গিয়েছে। সেইসব হাতীর মাংস এত টাট্কা ছিল যে, অক্‌সংলার্ডের এক ভোজ-সভায় ডিন্ ব্যাক্‌ল্যাণ্ড, অতিথিদের সেই লক্ষ বৎসর আগেকার হাতীর মাংস রেঁধে পরিবেশন ক'রে খাইয়েছিলেন। অতিথিরা খাবার সময় কেউই এ-ব্যাপার জানতেননা। খাওয়া শেষ হয়ে গেলে ঘটনাটি তাঁদের বলা হয়। শুনে তাঁরা সকলেই একবাক্যে বললেন, তাজা মাংসের সঙ্গে তার কোনো প্রভেদ ছিলনা। লেলিনগ্রাড-মিউজিয়ামে আজও এইরকম একটি হাতী সংরক্ষিত ক'রে রাখা হয়েছে—যদি কোনোরকমে হঠাৎ তার প্রাণ ফিরে আসে।

———

কয়েকজন জন-নায়কের শৈশব
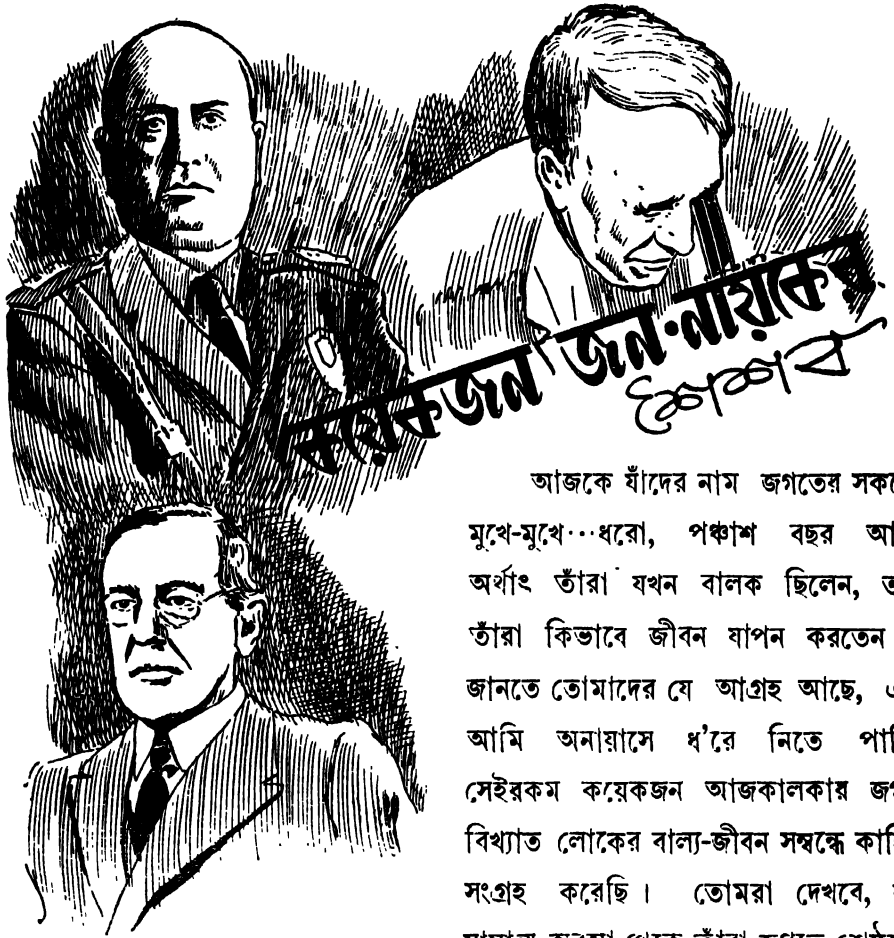
আজকে যাঁদের নাম জগতের সকলের মুখে-মুখে···ধরো, পঞ্চাশ বছর আগে, অর্থাৎ তাঁরা যখন বালক ছিলেন, তখন তাঁরা কিভাবে জীবন যাপন করতেন তা জানতে তোমাদের যে আগ্রহ আছে, এটা আমি অনায়াসে ধ'রে নিতে পারি। সেইরকম কয়েকজন আজকালকার জগৎ-বিখ্যাত লোকের বাল্য-জীবন সম্বন্ধে কাহিনী সংগ্রহ করেছি। তোমরা দেখবে, কত সামান্য অবস্থা থেকে তাঁরা জগতে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করেছেন। যদি তোমাদের বড় হবার সত্যিকারের ইচ্ছে থাকে এবং সেইসঙ্গে যদি থাকে অধ্যবসায়···যদি থাকে বার-বার বিফল হয়েও এগিয়ে-চলবার সাহস আর ইচ্ছা···তাহ'লে তোমাদের অবস্থা যাই হোক্‌না কেন, তার মধ্যে থেকেই তোমরা নিশ্চয়ই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে।

'মুসোলিনি'র নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছো। ইতালীর তিনি ছিলেন সর্ব্বময়-কর্ত্তা। একদিন তিনি মোটরে এক দূর গ্রামে যাচ্ছিলেন, বিশেষ দরকারী কাজে। পথে এক গ্রামের মধ্যে এসে হঠাৎ তাঁর মোটরের একটা কল এমন খারাপ হয়ে গেল, যেটা মেরামত না ক'রে নিলে গাড়ী আর চলবেনা। কিন্তু তার জন্যে দরকার একজন কর্ম্মকারের। আগুনে লোহা পুড়িয়ে সেটাকে মেরামত করতে হবে। মোটর থেকে নেমে গ্রামের কর্ম্মকারের খোঁজ নিয়ে তার বাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেদিন কি একটা পর্ব্ব থাকার দরুণ কামারশালা বন্ধ ছিল। বুড়ো-কর্ম্মকার সেদিন আর লোহা ধরতে কিছুতেই রাজী হলোনা। তখন মুসোলিনী বললেন, "আচ্ছা, আমাকে তোমার হাপর দেখিয়ে দাও, তোমাকে লোহা ছুঁতে হবেনা, আমি নিজেই সব ক'রে নেবো'খন।"

ভদ্রলোকটির পোষাক-পরিচ্ছদের দিকে চেয়ে বুড়ো হেসে ব'লে উঠলো, "ও-পোষাকে কি—লোহা তাতাতে পারবেন? অত সোজা নয়।"

যা হোক্, বৃদ্ধ অগত্যা মুসোলিনীকে কামারশালায় নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে দিলেন। গায়ের জামা খুলে ইতালীর হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা হাপরে ফুঁ দিতে আরম্ভ করলেন। বৃদ্ধ একপাশে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। দেখলেন, কি আশ্চর্য্যের ব্যাপার! অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিখুঁত ভাবে সব কাজ সেরে ভদ্রলোকটি ধন্যবাদ জানাবার জন্যে হাত বাড়ালেন। যাবার সময় মুসোলিনী বুড়োকে ডেকে বললেন, "জানেন, আমি কে? আমার নাম—মুসোলিনী। আপনারই মতন এক বুড়ো-কর্ম্মকারের ছেলে আমি।"

প্রিদাপ্পিয়ে ব'লে ইতালীর এক নগণ্য-গ্রামে মুসোলিনী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা অনেক শহর ঘুরে শেষে তাঁদের গ্রামে এসে একটা কামারশালা খুলে বসেন। আশ-পাশের গ্রামের যা-কিছু লোহার-কাজ, সেই কামারশালা থেকে লোকে করিয়ে নিয়ে যেতো। তাঁর মা কিছু লেখাপড়া জানতেন। তিনি সেই কামারশালার ধারে

একটা ছোট পাঠশালা খুলেছিলেন। গ্রামের ছেলে-মেয়েরা তাঁর সেই পাঠশালায় পড়তো। আর পড়তো তাঁর সেই দুর্দ্দান্ত ছেলে—মুসোলিনী।

পড়া হয়ে গেলে মুসোলিনীকে কামারশালায় গিয়ে বাপের সাহায্য করতে হতো। গরম-লোহা পেটবার সময় তার আগুনের ফুল্‌কি এসে গায়ে লাগতো···বালক সচকিত হয়ে উঠতো! নদীর ধারে ঘুঘুর-বাসা তখন তার মনকে ডাকতো। তখন কি আর লোহা পিটোতে ভালো লাগে! বালক লুকিয়ে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতো। রীতিমত একটি দল ছিল তার। অমুক বাগানে আপেলে রঙ ধরেছে·· সেই দল নিয়ে আপেল চুরি করতে বেরুতো। তারপর বাড়ী ফিরে আসতেই প্রচুর প্রহার! পরের দিন কামারশালায় কড়া পাহারা বসলো। তার বাবা বলতেন, "আগুনে পুড়িয়ে, হাতুড়িতে পিটিয়ে এই লোহার মতন করেই ছেলেকে মানুষ ক'রে তুলতে হয়।"

তোমরা যদি মুসোলিনীর কোনো ছবি দেখে থাকো তাহ'লে লক্ষ্য ক'রে দেখবে, পাকা ইস্পাতের মতন তাঁর মুখ দৃঢ়, উজ্জ্বল এবং কঠিন।

* * * *

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নাম বোধহয় তোমরা জানো। এই যুক্তরাষ্ট্রের মতন ক্ষমতাশীল রাষ্ট্র আজ জগতে নেই। য়ুরোপের অনেক বড়-বড় জাতির ভাগ্য এই যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভর করছে। এই বিশাল রাজ্যের যিনি শাসনকর্ত্তা, তাঁকে প্রেসিডেণ্ট বলে। এত-বড় দায়িত্বপূর্ণ-পদ জগতে আর নেই। আজকালকার জগতে সুখ-শান্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য সব ঐ একটি লোকের বিবেচনার উপর যতখানি নির্ভর করে, এমন আর কারুর উপর করেনা। বড় হয়ে তোমরা যখন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস পড়বে, তখন দেখবে, তার অনেক বড়-বড় প্রেসিডেণ্টই অতি নিম্ন-স্তরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শুধু অধ্যবসায় আর নিজের শক্তিতে তাঁরা সকল রকম বাধাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে জাতির সর্ব্বপ্রথম-স্থান অধিকার করেছিলেন। কিছুদিন আগে প্রেসিডেণ্ট ছিলেন—মিঃ হার্ডিঞ্জ। কিন্তু যখন তিনি ছেলেমানুষ ছিলেন, তখন তাঁর কাজ ছিল, গরু-ছাগল চরানো। তোমরা বোধহয় জানো যে··· নিউটনের বালক-কালও এইরকম ভাবে অতিবাহিত হয়েছিল। গরু ছেড়ে দিয়ে

গাছ-তলায় ব'সে, বিভোর হয়ে একখানা পুরোনো জ্যামিতির বই নিয়ে পড়তেন, ওধারে গরুগুলো পরমানন্দে পরের ক্ষেতে ঢুকে শস্য নষ্ট করতো··· অবশ্য, হার্ডিঞ্জের মনিবকে এরকম দায়ে পড়তে হয়নি। সামান্য কিছু সাপ্তাহিক-বেতনে বালক হার্ডিঞ্জ এক কৃষকের ক্ষেতে কাজ করতেন। সারাদিন মাঠে-মাঠে কাটতো; গরুর জন্যে খড় কুটতে হতো, ঘাস কাটতে হতো, সন্ধ্যেবেলায় খোঁয়াড়ে গরুদের রেখে তবে ছুটি পেতেন।

বালকের মন কিন্তু এই খাটুনিতেই খুশী থাকতো। কাজ করতে তাঁর ছিল প্রভূত আনন্দ। অবশ্য, রাত্রিবেলায় বাড়ী ফিরে এসে বই নিয়ে বসতেন। চির-জীবন কি কেউ খড় কুটতে চায়? অন্তত, আমরা জানি, হার্ডিঞ্জ চাননি! তাঁর মনের বাসনা ছিল যে, তিনি স্কুল-মাষ্টার হবেন। এইভাবে নিজের অবসর-সময়ে জ্ঞান অৰ্জ্জন ক'রে তিনি ক্ষেতের কাজ ছেড়ে দিয়ে শেষে স্কুল-মাষ্টার হলেন। স্কুল-মাষ্টারী করতে-করতে তাঁর মনে হলো যে, জার্নালিজম্, অর্থাৎ খবরের কাগজ চালানোর বিদ্যা শিখতে হবে। একেবারে তিনি গোড়া থেকে আরম্ভ করলেন। একটা প্রেসে কম্পোজিটার হলেন। কম্পোজিটারীর কাজ শিখে ধীরে-ধীরে তিনি প্রেসের অন্য সমস্ত কাজ শিখলেন। তারপর একটি খবরের কাগজ সম্পাদন করবার ভার পেলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর ষ্টেটে সেই কাগজখানি সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে উঠলো। এইভাবে অগ্রসর হতে-হতে তিনি জগতের সমস্ত জনতাকে পিছনে ফেলে রেখে' একেবারে সকলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি যে ছেলেবেলায় খুব মেধাবী ছেলে ছিলেন, তা নয়। তিনি জানতেন যে, সত্যিকারের চেষ্টা কখনো বিফল হয়না। পরে যখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হলেন, তখন তাঁর বৃদ্ধ বাবা বলেছিলেন, "আমার হার্ডিঞ্জ যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হবার সত্যিই উপযুক্ত। জীবনে সে যা-কিছু পেয়েছে, তার জন্যে আগে-থাকতে সে নিজেকে যোগ্য ক'রে তৈরী করেছে। উপযুক্ত না হয়ে কোনো অধিকার সে ভোগ করেনি। নিজেকে যোগ্য ক'রে গ'ড়ে তুলতে তার চেষ্টার অন্ত নেই।" সব বাপই যদি তাঁদের ছেলেদের সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলতে পারতেন, যে, উপযুক্ত না হয়ে আমার ছেলে কোনো অধিকার ভোগ করেনি!···

* * * *

ফেয়েড জর্জ্জ এবং ব্রিয়ঁা দু-জন জগৎ-বিখ্যাত রাজনৈতিক। একজন ছিলেন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী, আর একজন ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী। এঁদের শৈশবও দূর গ্রামে একান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। অতি শৈশবে ফেয়েড জর্জ্জ পিতৃহারা হন। দরিদ্র মা অতি কষ্টে সংসার চালাতেন। মাংস যে খেতে কি-রকম, ছেলেবেলায় তাঁরা তা জানতেই পারেননি। রবিবার দিন, আধখানা ক'রে ডিম ছিল তাঁদের রাজ-ভোগ। কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল। পাড়ার লোকদের উদ্‌ব্যস্ত ক'রে···হৈ-হৈ ক'রে বালক পরমানন্দে থাকতো। দুপুরবেলায় ঘরে-ঘরে সবাই ঘুমুচ্ছে; বালক জর্জ্জ দলবল নিয়ে প্রবল জোরে টিনের ক্যানাস্তারা বাজাতে আরম্ভ করলেন সমবেতভাবে। চারদিক থেকে লোক ছুটে এসে—এই মারে তো এই মারে! তাঁর এক কাকা ছিলেন—তিনি গ্রামের লোকের জুতো তৈরী করতেন। জর্জ্জ এই কাকাটির বড় প্রিয় ছিলেন। তিনি পয়সা জমিয়ে, ভাইপোটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে, আইন পড়বার জন্যে শহরে পাঠিয়ে দেন। ফেয়েড জর্জ্জ জীবনে সে-কথা ভোলেননি। ···তখন তিনি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী, রাজ-কার্য্যে ভীষণ ব্যস্ত আছেন, এমন সময় খবর পেলেন যে, তাঁর কাকা পরলোক গমন করেছেন। সমস্ত রাজ-কার্য্য ফেলে রেখে তিনি সেই বৃদ্ধের কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

ব্রিয়ঁা একজন সামান্য সরাইওয়ালার ছেলে ছিলেন। হের্ ইবার্ট মহাযুদ্ধের পর যিনি জার্ম্মাণ রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্ট হন, তিনি একজন গ্রাম্য-দরজীর ছেলে। চেকোশ্লোভাকিয়ার সভাপতি জগৎ-খ্যাত ডাঃ মাসারিক, তিনিও মুসোলিনীর

ধাম এবং পড়াশুনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। বৃদ্ধ যখন শুনলেন যে, লেখাপড়া তিনি আদৌ জানেননা, তখন তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন। সেই বৃদ্ধ চেষ্টা ক'রে সামান্য বৃত্তি জোগাড় ক'রে তাঁর লেখাপড়ার জোগাড় ক'রে দিলেন। সেইদিন থেকে তাঁর জীবন-ধারা অন্যদিকে প্রবাহিত হলো। তাঁদের গ্রামে মাঝে-মাঝে শহর থেকে রীতিমত হোমরাচোমরা সব রাজপুরুষরা আসতেন শিকার করবার জন্যে। যে-ক'দিন তাঁরা থাকতেন, তাঁদের স্বেচ্ছাচারে গ্রাম অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো। মাসারিক যখন শিশু ছিলেন, তখন এইসব রাজপুরুষদের দেখলেই তিনি বড় ভয় পেতেন। তারপর বড় হয়ে, অধিকার হাতে পেয়েই তিনি দেশ থেকে এদের তাড়িয়ে, আজ তাঁর জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন।

* * * *

এডিসনের নাম আজ জগতের ঘরে-ঘরে। তাঁর তৈরী হাজার-রকম যন্ত্রে আমাদের বর্ত্তমান-সভ্যতা ভ'রে আছে। যন্ত্র তৈরী করার দিক দিয়ে জগৎ এত ঋণী আর কারুর কাছে নয়, যেমন এই একটি লোকের কাছে। সেই এডিসন এগারো বছর বয়সে ট্রেনে-ট্রেনে কাগজ ফিরি ক'রে বেড়াতেন। রেলের গার্ড—মালগাড়ীর এক কোণে এডিসনকে একটুখানি জায়গা অনুগ্রহ ক'রে ছেড়ে দিয়েছিলেন। গার্ডসাহেব স্বপ্নেও ভাবেননি যে, সেইখানে এই খবরের কাগজ-বিক্রি-করা ছেলে একটা ছোট-খাটো রাসায়নিক-পরীক্ষাগার গ'ড়ে তুলবে! যখন ফিরি করতে হতোনা, তখন বালক সেই কোণে ব'সে আপনার মনে এসিড নিয়ে নানা রকমের সমস্ত পরীক্ষা করতেন। কেউ তার কোনো খবর রাখতোনা। একদিন হঠাৎ এসিডের গোলমালে, মালগাড়ীতে আগুন লেগে গেল! গার্ড ছুটে এসে

—এডিসন—

ব্যাপার দেখে, রেগে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে ধাক্কা মেরে এডিসনকে ট্রেনের বাইরে ফেলে দিলেন। এত জোরে তিনি এডিসনকে কান ম'লে দিয়েছিলেন যে, সেই থেকে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি কানে আর ভালো শুনতে পেতেননা। কিন্তু সেই ধাক্কা-খাওয়া ছেলে সেখান থেকে উঠে হাঁটতে আরম্ভ ক'রে যেখানে এসে পৌঁছোলো, সেখানে পৃথিবীর সকল জাতির শ্রেষ্ঠ লোক তাঁকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে ধন্য হয়ে গেল।

*　　*　　*　　*

রেডিয়ামের আবিষ্কর্ত্তা ম্যাডাম কুরীর নাম তোমরা নিশ্চয়ই জানো। বিজ্ঞানের জন্যে তিনি দু'বার নোবেল-প্রাইজ পেয়েছিলেন। যখন তিনি তাঁর স্বদেশ, পোলাণ্ড ত্যাগ ক'রে বিজ্ঞান পড়বার জন্যে প্যারিসে এলেন, তখন তিনি অতি অল্প ভাড়ায় একটি অন্ধকার ঘরে থাকতেন। আগুন পোয়াবার কাঠ পর্য্যন্ত তাঁর জুটতোনা! স্যাঁতসেঁতে ঘরে এত ঠাণ্ডা পড়তো যে, দুধ পর্য্যন্ত জমে যেতো। আজ প্যারিসের একটা বড় রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে তাঁর নামে।

*　　*　　*　　*

নেপোলিয়ান বলতেন যে, "প্রত্যেক সাধারণ-সৈনিকের পিঠে যে ব্যাগ থাকে, তার ভিতরে এক-একজন বড়-বড় সেনাপতি আছে।"

*　　*　　*　　*

এইসমস্ত জীবনী আলোচনা ক'রে, আমরা সেই কথার সত্যতা আরও বেশী ক'রে বুঝতে পারি। আজই যখন রাস্তা দিয়ে ভিড় ঠেলে চলে এসেছি, হয়তো সেই ভিড়ের মধ্যে তখন মলিন-বাসে, খালি-পায়ে যাকে দেখে তার দিকে ফিরেও চাইলামনা—একদিন হয়তো মুগ্ধ একাগ্র-দৃষ্টিতে সেদিকে চাইবো শুধু তাকেই দেখবার জন্যে।

শেষ